তৃতীয় সংস্করণ :
এপ্রিল, ১৯৬০ ।

প্রকাশক : ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রণ
রমেন্দ্র চন্দ্র রায়
প্রিণ্টস্মিথ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড,
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
বিভূতি সেনগুপ্ত

রাজকুমারীকে—

'হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে
আমার চারদিকে চিরকাল ধরে,
আমি-বনস্পতির এরা কিরণ পিপাসু পল্লবস্তবক,
এরা মাধুকরী ব্রতীর দল।
* *
বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।'

# পরিচিতি

ভ্রমণকাহিনী সাহিত্যের একটা বড় মহল। শুধু বড় নয়, এ মহলের দিকে আমাদের এমন একটা স্বাভাবিক টান আছে যার জন্যে সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিচারও আমরা অধিকাংশ সময়ে স্থগিত রাখতে প্রস্তুত। সাহিত্যের দরবারে এমন অনেক লেখাকে সমাদরে ঠাঁই আমরা দিয়েছি পথের ধুলোর দৌলতেই যাদের অন্য সব দৈন্যবিকৃতি অনেকখানি চাপা পড়েছে। পথের ধুলো গায়ে না মাখা থাকলে জাতবিচারের জেরায় তাদের জেরবার হবারই কথা।

শুধু ছাই মেখে যেমন সাধু হওয়ার চেষ্টা, এই বাড়তি কদরের দরুন, সাহিত্যের চোখেও পথের ধুলো দেবার দৃষ্টান্ত তেমনি বিরল নয়। অতি অল্প মূলধনে এমন লাভের কারবারের লোভ সকলের পক্ষে সামলানও শক্ত।

সুখের কথা এই যে ভ্রমণসাহিত্যে ভেজাল ও মেকির কারবারের ভিড়েও মাঝে মাঝে আশ্চর্যভাবে এমন খাঁটি জিনিষের সাক্ষাৎ আমরা পাই, ভ্রমণের সাজটা যেখানে ভেক নয় মাত্র।

ভ্রমণকাহিনীতে পায়ের চলাটাই ত সব নয়, মনের চলাটাই আসল। শুধু ঘর ছেড়ে বার হওয়া নয়, বাইরেকে ঘর করবার মত অন্তরের ঐশ্বর্য ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতাও চাই। প্রতি মুহূর্তে বাইরের সবকিছু রঙ ও রস ধরবার মত সজাগ মনের চোখ মেলে রাখতে না পারলে বিশ্বভুবন ঘুরেও কিছুই মেলবার নয়।

সেই মন যতখানি সজাগ, সজীব, সত্যাশ্রয়ী ও গভীর, ভ্রমণ-কাহিনীও ততখানি সার্থক। 'শৈলপুরী কুমায়ুন' এমনি একটি সার্থক ভ্রমণকাহিনী।

হিমালয় নিয়ে আমাদের দেশে অনেক ভ্রমণকাহিনীই লেখা হয়েছে। হিমালয়ের অবশ্য তাতে পুরানো হয়ে যাবার কোনো

আশঙ্কা নেই। কিন্তু হিমালয়ে অফুরন্ত বৈচিত্র্য, বর্ণনাতীত মহিমা ও অশেষ রূপৈশ্বর্য সত্ত্বেও, ভ্রাম্যমাণের সস্তা মনের মাপে ভ্রমণকাহিনী অনেক সময়েই মামুলি উচ্ছ্বাসের একঘেয়েমির ওপরে উঠতে পারে না।

শৈলপুরী কুমায়ুনে যাওয়া মানে এভারেষ্ট-বিজয় কি দুর্গম অজ্ঞাত পার্বত্য অধিত্যকা আবিষ্কার নয়। হিমালয়ে কোথাও টহল দিয়ে এলেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের একচেটিয়া অধিকার জন্মায় না। লেখক সেরকম কোনো দাবীও কোথাও পেশ করেন নি। লণ্ঠন জ্বেলে সূর্যের তেজ উজ্জ্বলতর করার মত হিমালয়ের বিস্ময় বাড়াবার জন্যে চোখ-ধাঁধানো নায়ক-নায়িকা আমদানি করে তাদের চমক-দেওয়া বাকচাতুর্যে আমাদের বিমূঢ় করে দেবার কোনো চেষ্টা তাঁর নেই। ক্ষণে ক্ষণে ধ্যানস্থ হয়ে নিজের নিগূঢ় আত্মোপলব্ধি তিনি আমাদের শুনিয়ে ধন্য করতে যেমন বসেন নি, অজীর্ণ ইতিহাস ভূগোল আউড়ে পণ্ডিত সাজবার চেষ্টাও করেন নি তেমনি। সহজ স্বাভাবিক রুচিবান রসিকের মত হিমালয়ের একটি নাতি-পরিচিত অঞ্চলে সবন্ধু বেড়াতে গিয়ে ছোট বড় তুচ্ছ ও বিশেষ যা সব কিছু তিনি দেখেছেন, অনুভব করেছেন, তারই আনন্দ সরল সত্যনিষ্ঠভাবে অকৃত্রিম অথচ সরস ভাষায় পাঠকদের কাছে পরিবেশন করেছেন। কোনো ভড়ং কোথাও নেই বলেই 'শৈলপুরী কুমায়ুন' প্রকৃতি ও মানুষের অনাদি অনন্ত রহস্যের রঙে আশ্চর্যভাবে রঙীন হয়ে উঠেছে। ভ্রমণ-বিশারদের অহমিকা থেকে মুক্ত বলেই গিরিশিখরের দৃষ্টিতে সমতলকে না দেখে লেখক পাঠককে তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী করতে পেরেছেন। আর সেখানেই ভ্রমণকাহিনীর পরম সার্থকতা।

'শৈলপুরী কুমায়ুন' লেখক একবারই গেছলেন, কিন্তু এ কাহিনীতে তাঁর সঙ্গে বার বার সেখানে গিয়েও পাঠকের আশ মিটবে না, এটুকু অন্ততঃ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি।

**প্রেমেন্দ্র মিত্র**

## কথারম্ভ

'দুর্গম তুষার গিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বার বার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।'

কবিতাটি ক্লাসে পড়তে গিয়ে হঠাৎ অভ্যস্ত কথার খেই কেটে যায়। অবাক হয়ে দেখি ক্লাস-রুমের ভেতর রোদ্দুরের লিখনলেখা প্রকৃতির নিমন্ত্রণ-লিপিটি পড়ে আছে। চাঁপাফুলের রঙ লেগেছে তার গায়।

জানালার বাইরে চোখ চলে যায়। নিঃসীম নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের সারি-সারি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। তার ভেতর থেকে যেন আলোর ঝরণাধারা উপচে পড়ে যাচ্ছে। চারদিকে শরতের সংসারের বিপুল আয়োজন। আর সেই আনন্দযজ্ঞে যোগ দেবার জন্যে দিকে-দিকে চলেছে শরতের নিমন্ত্রণ-লিপি।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ছকে-বাঁধা জীবনযানটি চালিয়ে যাই। নিয়মশৃঙ্খলার বাঁধা রাস্তা ধরে দিনযাত্রায় সে গড়িয়ে চলে। কিন্তু হঠাৎ কখন শরতের আলোক-সরোবর থেকে পদ্মগন্ধী বাতাস ভেসে আসে। মৌমাছিরা গুনগুনিয়ে রুটিন-বাঁধা কাজের ভেতর অনাসৃষ্টির ঢেউ তোলে। তখন মন চায় অকাজের কাজ করতে।

পুঁথির শুকনো পাতা সরিয়ে রেখে কথার ফুলে মালা গাঁথা চলে,—

'—যাচ্ছো কোথায় ?

—দেশে।

—কোথায় তোমার দেশ ?

—পূব বাংলায় ?'

দিনের পর দিন পড়াশোনা আর কাজকর্মের ভেতর যে দেশটিকে ওরা ভুলেছিল এতদিন, শরতের আকাশের তলায় ছুটির অবকাশের খবর পেয়ে মনে পড়েছে তার কথা। মনে পড়ছে জলে-ভরা ঝিল-বিলের ওপর জেগে-ওঠা নীল লাল শালুকের কথা—আর জাগছে ইছামতী কপোতাক্ষীর ক্ষীরনীরে নাও ভাসাবার স্বপ্ন।

বাইরে ঘণ্টা পড়ে, ক্লাস ফুরোবার ঘণ্টা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সময় কিন্তু তখনও রয়েছে মিনিট-দুয়েক বাকী।

ক্লাস ছেড়ে যেতে-যেতে করিডোরে দেখা হয় গঙ্গারামের সঙ্গে।

ত্রুটিটুকু শুধরে দিয়ে বলি, দু মিনিট আগেই ঘণ্টা দিলে যে ?

দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গঙ্গারাম কেমন যেন লজ্জা পেয়ে যায়।

বলে, তাই তো বাবু, ভুল হয়ে গেছে।

মনে-মনে বলি, ভুল না হয়ে কি পারে। গঙ্গারামের মনের ঘড়িটি এখন দেশমুখী, তাই দেয়াল-ঘড়ি পারছে না তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে।

বাসায় ফিরছি দেখা হল শিল্পীর সঙ্গে।

ক্লাস ফুরোল নাকি ? হেসে প্রশ্ন করেন তিনি।

বলি, রুটিন-বাঁধা কাজগুলো আর বাগ মানছে না কোন-মতেই। ক্লাস ফুরোবার আগেই ক্লাস পালানো শুরু হয়েছে। অযাত্রা পথে যাবার জন্যে এখন থেকেই মন উড়ু-উড়ু।

চলতি পথে থেমে গেলেন শিল্পী। বললেন, মনের কথাটি বলেছ ভাই, একটুও মন বসছে না কাজে। বেলফুলের মালা

আঁকতে গিয়ে কখন বোঁটায় লাগিয়ে দিয়েছি হলুদ রঙের ছোপ। বুঝতে পারি শিউলি ফোটার কাল এসেছে।

এরপর দু জনে মিলে চলল জল্পনা-কল্পনা। স্থান কাল স্থির করে যখন ঘরে ফিরলাম তখন চারদিকে বাজছে ছুটির বাঁশির সুর। সেই সুরে কমায়ুনের শৈলপুরীর আহ্বানটি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

# পথের পরিচয়

'শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যাকিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে-ফেলে যাও।'

ভ্রমণে চাই সঙ্গী, বলেন বিপ্রদাসবাবু, সঙ্গীহীন ভ্রমণে স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই মশাই।

গয়া স্টেশনে উঠেছিলেন নিঃসঙ্গ এক ভদ্রলোক, প্রৌঢ় পঞ্চাশোত্তর রসমধুর চেহারা। উঠেই বললেন, আঃ বাঁচা গেল, মশায়েরা বাঙালী রয়েছেন দেখছি।

তারপর অবশ্য প্রত্যুত্তরের আর অপেক্ষা রাখেন নি। বিছানাটি মেঝেতে পেতে ফেলে তার ওপর দিব্যি বসে পড়লেন আসনপিঁড়ি হয়ে। ঘটির মুখ থেকে খানিকটা জল ঢক-ঢক করে কণ্ঠে ঢেলে নিয়ে একটা পরিতৃপ্তির আওয়াজ তুললেন।

তারপর আবার কথারম্ভ, পিতাঠাকুর বলতেন, ভ্রমণ করতে গেলেই চাই সঙ্গী, নইলে আনন্দের আদ্দেক মাটি। তেমন-তেমন সেথো নইলে স্বর্গে গিয়েও সুখ মেলে না।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।

এতক্ষণ একতরফা কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন উনি, এবার কিছু বলতেই হয়। বললাম, মশায় কি সঙ্গী-সাথীদের পাশের কামরায় রেখে এসেছেন নাকি ?

গলা খুলে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।

বললেন, সঙ্গী, তা সঙ্গেই যদি না রইল তাহলে আর সঙ্গী

হল কি করে মশাই! এই দেখুন না, আসছিলাম হাওড়া থেকে এক সঙ্গে, ওঁরা সব নেমে গেলেন একে-একে কে কোথায়; জনাকয় কাঠখোট্টা আদমীর সঙ্গে বেচারা আমিই রইলাম গাড়ি আগলে। সইবে কেন মশাই, কথা নইলে প্রাণ বাঁচে? শেষে ইন্সপেক্টর সাহেবকে ধরে থার্ড ক্লাসের টিকিটখানাকে সেকেণ্ড ক্লাসে প্রমোশন করিয়ে নিয়ে ঢুকে পড়েছি আপনাদের কামরায়। এখন সঙ্গী বলুন, সহযাত্রী বলুন—আপনারাই।

আবার হাসলেন ভদ্রলোক। সরল সহাস মানুষটি। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতই।

যাচ্ছেন কদ্দূর? প্রশ্ন করলাম।

গাড়ি যেখানে থামবে আপাতত সেখানেই নামব, তারপর চোখজোড়া যে দিকে বলবে সে দিকেই চরণদুটি চালাব। ওসব পুণ্যিটুন্যির লোভ নেই মশায় আমার। বুড়ো হলাম তবু তীর্থ-বাসনা একবারটিও ঢোকাতে পারলাম না মগজে। এসব অবশ্য আমার পিতৃদেবেরই শিক্ষা।

বললাম, ভ্রমণের নেশাটা আপনি বোধকরি আপনার পিতার কাছ থেকেই পেয়েছেন?

কথাটা লুফে নিলেন বিপ্রদাসবাবু। কপালে হাতজোড়া ঠেকিয়ে শূন্যে চোখ তুলে অদৃশ্য পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে বললেন, প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন তিনি। চক্কোত্তি মশায়ের টোলে অধ্যাপনা করতেন। পূজোর ছুটিতে বের হতেন। পুরো দুটি মাস একেবারে সংসার-চিন্তা বিরহিত। তখন তাঁকে দেখলে কে বলবে যে বৃহৎ একগুষ্টি ছা-পোষা সংসারের একমাত্র কর্ণধার তিনি। সে সময়ে পিতৃদেব একেবারে অন্তর্মুখী। তখন, কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।

বিধবা পিসি যদি কখনো বলতেন, গোলক, তুই তো কাশী বিন্দেবন ঘুরছিস, একবার বুড়ো দিদিটাকে নিয়ে চল না ভাই সঙ্গে করে।

অমনি বাবা বলতেন, দিদি, পুণ্যির লোভ থাকে তো রোজ

সর্বপাপহারিণী মা গঙ্গার শীতল জলে প্রাণভরে চান কর, আর কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের চার পাশে মাথা ঠুকে-ঠুকে প্রদক্ষিণ কর, ব্যস্।

'কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী
কালীর চরণ কৈবল্যরাশি!'

অমনি রামপ্রসাদের পদ গেয়ে পিসিকে প্রবোধ দিতেন। বাবা আমাদের পড়াতে গিয়ে বলতেন, কি হবে পুঁথিপত্তর পড়ে। চোখ দিয়ে সব চেখে-চেখে দেখে যা, যেমন করে জিভ দিয়ে রান্না তরকারি চাখে।

বলতে-বলতে বিপ্রদাসবাবু ফতুয়ার অন্দরমহল থেকে একটি বিড়ি বের করে সঙ্গী শিল্পীর কাছ থেকে দেশলাইটি চেয়ে নিয়ে ধরালেন। তারপর কয়েকটি টান দিয়ে বলতে লাগলেন, পিতাঠাকুরের আবার ভ্রমণের এক সঙ্গী ছিলেম, আমরা তাঁকে ডাকতাম সেথো কাকা বলে। তিনি আবার ছিলেন খোদ সাহেব।

বললাম, বলেন কি, সাহেব সঙ্গী, এমন তো কখনো শুনি নি!

বিপ্রদাসবাবু হাসলেন। সে এক বেত্তান্তো মশাই! সাহেবটির নাম হল লং সাহেব। কিন্তু মশাই, মাথায় একেবারে বেঁটে খাটো; তবে পুরুষ্টু নধরকান্তি মানুষটি। সেবার শীতের বিকেল। বাবা বসে বাহিরের ঘরে আমাদের পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ। সাড়ে তিন হাত হাওড়া হাটের চাদরখানাকে কোনরকমে গায়ে জড়িয়ে বসেছিলাম; বাবার আদেশে হি-হি করে কাঁপতে-কাঁপতে দোর খুলতে উঠতে হল। কিন্তু দরজা খুলেই আক্কেল গুড়ুম। একেবারে খোদ সাহেব হ্যাটকোট পরে আমায় শুধুচ্ছে, বোট্চাজ মোশায় বাড়ী আছেন?

আমি আর জবাব দেব কি, যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। সাহেব এসেছে মানে রক্ষে নেই, এখুনি কিছু একটা অঘটন ঘটবে। তাই একদৌড়ে একেবারে রান্নাঘরে মাতৃ-অঞ্চলে প্রবেশ করলাম।

অনেক পরে বাবা এসে বললেন, সাহেব নাকি তাঁর কাছে দেবভাষা সংস্কৃত পড়তে চায়। এও শুনলাম, পারিশ্রমিক বাবদ সাহেব একশত টাকা মাসিক দক্ষিণা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাবা নাকি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, নাহং বিদ্যা বিক্রয়ং করিষ্যামি। শেষে সাহেবের আকুলতা দেখে বাবা তাঁকে পড়াতে রাজী হয়েছেন।

পিসি তো রেগেই আগুন। বললেন, বলিস কি রে গোলক, এতগুলি টাকা ছাড়লি, তার ওপর ঐ গো-খাদক ম্লেচ্ছটাকে পড়াবি!

বাবা বললেন, সে ভাবনা নেই দিদি, একেবারে খড়ম ছুঁয়ে সাহেব প্রতিজ্ঞা করে গেছে, এ জন্মে সে আর গোমাংস ছোঁবে না।

এরপর প্রতি শনি মঙ্গল বার সাহেব আমাদের বাড়ি আসতেন। বাবা আর পিসিকে বড় ভক্তি করতেন। পিসি কিন্তু সাহেবের আসার সময় হলেই দোরগোড়ায় দাঁড়াতেন গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে। সাহেব এলেই তাঁর গায়ে মাথায় গোবর ছড়া দেবার মত গঙ্গাজলের ছিঁটে দিয়ে শুদ্ধ করে নিতেন। সাহেব আমাদের বাড়িতে পূজোর প্রসাদী বাতাসা আর কলার কুচি খেতেন। বেলপাতা মাথায় ছোঁয়াতেন। সাহেবকে একা-একা পেলেই আমাদের খুব মজা লেগে যেত। যখন তখন লং সাহেব আমাদের জন্যে ছবির বই নিয়ে আসতেন। কাছে পিঠে পিসি না থাকলে আমরা ভাইবোনে লং সাহেবের লম্বা পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে নানা রঙের লজেন্স বের করে-করে খেতাম।

সেই সাহেবই পিতার সঙ্গে ভ্রমণে বেরুতেন পূজোর সময়। এত টাকার মালিক তবু পিতার সঙ্গে-সঙ্গেই থাকতেন চটি আর ধর্মশালাতে। শুতেন মাদুর পেতে, কম্বল মুড়ি দিয়ে।

বিপ্রদাসবাবু থামলেন। বিড়িটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, সেটির শেষ প্রান্তে চিমটি দিয়ে ধরে জোরে একটি টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে।

ভদ্রলোকের বলার ধরন-ধারণে আর বিষয়ের অভিনবত্বে আসরটি

বেশ জমে উঠেছিল; কিন্তু এবার একটানেই তিনি ছেদ ফেলে দিলেন।

এক পূজোর ছুটিতে বাবা তৈরি হয়েছেন বাইরে যাবার জন্যে। বিজয়ার দিনেই রওনা দেবেন। সঙ্গী লং সাহেবও আসবেন ঐ দিন। কিন্তু নবমীর দিন প্রতিমাদর্শনে গিয়ে বাবা ফিরে এলেন রিক্সোয়, প্রায় অচৈতন্য অবস্থায়। বৈদ্য এল, কিন্তু সন্ন্যাস রোগ, বাঁচান গেল না। নবমীর শেষ রাতে দেবীপূজার অন্তে পিতৃদেব চোখ বুজলেন।

ভোরে যথারীতি বিছানাপত্তর বেঁধে সাহেব আমাদের বাড়ি এসে হাজির। কিন্তু তখন পিতৃদেব চলে গেছেন অনেক দূরে। দুঃসংবাদ শুনে, মশায় বিশ্বাস করবেন না, সাহেব একেবারে হাউ মাউ করে কান্না জুড়ে দিলেন, তাঁর সে কান্না থামায় কার সাধ্যি। শেষে খালি পায়ে শবযাত্রার সঙ্গে-সঙ্গে শ্মশানে অবধি গেলেন। তারপর সেই যে লং সাহেব ডুব দিলেন আর আমাদের বাড়িমুখো হলেন না।

বললাম, সে কি, সাহেব আর এলেনই না একেবারে?

না, আর আমাদের বাড়ি আসেন নি কোনো দিন, বললেন বিপ্রদাসবাবু, তবে চার-পাঁচ মাস পরে পিসির তাগাদায় একবার ঠিকানা খোঁজ করে সাহেবের বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম, বাড়ি বিক্রী করে সাহেব দেশে চলে গেছেন।

কথায় ছেদ ফেলে দিয়েছেন বিপ্রদাসবাবু।

ডিহিরি-অন-শোন এসে গেছে। শোন নদীর ওপর দীর্ঘ সেতু। চক্রের ঝঙ্কার তুলে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। শীতে প্রবাহিণী শোনের শীর্ণা মূর্তি—অহল্যানিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকে। বর্ষায় শোন প্রেম-পাগলিনী, তখন একেবারে ব্রজগোপিনী মূর্তি। লৌহরথ শত-চক্রের ঝঙ্কার তুলে এগিয়ে চলে, আর শোন তরঙ্গবাহু তুলে বলে,

'—যেতে নাহি দিব
তব রথ চক্রতলে প্রাণ দিব—।'

বেনারস সিটি থেকে আমাদের কামরায় উঠলেন কয়েকটি বাঙালী। মেয়ে-পুরুষ-বাচ্চা-কাচ্চায়, তা হবে সাত-আট জন। তার ওপর সচল এক সংসার; বেডিং, জলের কলস থেকে কড়া-খুনতির কোন কিছুই বাদ নেই। মুহূর্তে সারা কামরাটাই গ্রাস করে ফেললেন তাঁরা ক জনে।

বুড়ো কর্তা হিসেবী লোক। তাই প্রথম থেকেই তিনি মুখচোখে অনুনয়ের ভাব ফুটিয়ে গল্পকথার উটের মত আমাদের আশেপাশে এক-একটু করে স্থান করে নিচ্ছিলেন; কিন্তু গিন্নির দাপটে অবশেষে তিনি গুগ্‌লির মত গুপ্ত হয়ে গেলেন। ও পাশে নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রীতে তারি মাঝে একটু আসর করে বসে মুখোমুখি বাণী-বিনিময় করছিলেন, তাঁদের ওপর ফেটে পড়লেন গিন্নি ঠাকরুণ, একটু পা তুইল্যা বহেন, আমাগো কি যাইতে দিবান না, আরাম কইর‍্যা যাইতে চান ত উড়াজাহাজে চাইপ্যা যান।

আকস্মিক আক্রমণে সঙ্কুচিত হয়ে সরে বসলেন মেয়েটি; স্বামীকেও যথাসম্ভব কাছাকাছি সরিয়ে নিলেন। টিপিক্যাল গিন্নিটি বসলেন যথানিয়মে তিন-তিনটি প্রাণীর জায়গা দখল করে। বুড়ো কর্তা বসলেন একটি বেডিং-এর ওপর জড়োসড়ো হয়ে। অন্যগুলি ছড়িয়ে বসল এ দিক সে দিক।

পরের স্টেশনে আরও দু-তিনটি যাত্রী উঠলেন। অবাঙালী, সম্ভ্রান্ত অভিজাত বলে মনে হল। কথাবার্তায় বুঝলাম, দুটি বোন বুড়ো বাবাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন হরিদ্বারে। তাঁদের একটি কোন কলেজের অধ্যাপিকা। দরজার কাছেই তাঁরা তাঁদের ট্রাঙ্কটি রেখে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসলেন তার ওপর। মনে হল এঁদের আগমনে গিন্নি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। বার-বার কারণে অকারণে নবাগত-দের প্রতি কটাক্ষপাত করতে লাগলেন। গাড়ি চলেছে। বিপ্রদাস-বাবুর ঢুলুনি এসেছে। ইতিমধ্যে গিন্নি শ্রীচরণ-দুটি বেঞ্চে তুলে নিয়ে মালা গণনায় মনোনিবেশের চেষ্টা করছেন, আর আড়চোখে চাইছেন সুখী দম্পতিটির দিকে।

সন্ধ্যা নামছে। শুক্লা শরতের সন্ধ্যা। দিনের আলোকতরী সোনার পাল গুটিয়ে নিয়ে অস্ত অচলের ঘাটে চলে যাচ্ছে। শিল্পী তাকিয়ে আছেন, সম্ভবত সন্ধ্যার আকাশে রঙ ফেরা দেখছেন। কথা বলে তাঁর তন্ময়তা ভাঙতে চাইলাম না।

বাতি জ্বলেছে কামরায়। বিপ্রদাসবাবু বিছানাটি তারই মধ্যে মনোমত করে গড়ে নিচ্ছেন। অন্য দুটি যাত্রী স্বামিস্ত্রীতে কথা কইছেন অনুচ্চে। সাঁঝের আবছায় দূরের প্রান্তর অস্পষ্ট হয়ে আসছে। মোষের পিঠে চেপে একটি রাখাল গৃহে ফিরছে। একপাল ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে একটি ছোট ছেলে ডাক দিতে-দিতে চলেছে—প্রত্যুত্তর দিচ্ছে সম্ভবত তার কিশোরী দিদি প্রান্তরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যার ধূসর প্রলেপে দিনান্তের কাজটুকু ক্যানভাসে-আঁকা একটুকরো ছবি হয়ে ফুটে উঠছে। গৃহ-প্রত্যাবর্তনের কথাগুলি সন্ধ্যার আসরে সুর হয়ে ঝরে-ঝরে পড়ছে। মধুর তোমার শেষ যে না পাই—।

বাইরে তাকালাম, কালো আঁধারের প্রবাহ। মাঝে-মাঝে দু-একটি ফ্ল্যাগ স্টেশনের আলো ঝিকিয়ে উঠে হারিয়ে যাচ্ছে। ট্রেন চলেছে, সেই একটানা পথ চলার গান—ঝিক্-ঝিক্-ঝক্—ঝিক্-ঝিক্-ঝক্।

ফেটে পড়লেন গিন্নি ঠাকরুণ। চমকে চাইলাম।

—আঃ, মরণ, বেলাইল্লাপনা ছ্যাখনা, পুরুষ মাইন্ষের গায়ে গাও না লাগাইয়া বইলে চলে না?

এবারে বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল অবাঙালী দুটি মহিলা। সংকীর্ণ স্থানে বসতে গিয়ে বেডিং-এর ওপর উপবিষ্ট বুড়ো কর্তার গায়ে হয়তো মেয়েদুটির গায়ের ছোঁয়া লেগে গিয়ে থাকবে। গৃহিণীর শ্যেন দৃষ্টিকে তা এড়িয়ে যেতে পারে নি, তাই তারস্বরে এই সময়োচিত শাসন। একে মহিলাদুটি অবাঙালী, তার ওপর খাস ঢাকাই ভাষণে তাঁদের আপ্যায়ন করা হচ্ছে। কিছু একটা যে অঘটন ঘটেছে তা তাঁরা গিন্নির বিপুল অঙ্গ-সঞ্চালন থেকে আঁচ করতে পারলেও সঠিক ব্যাপারটা না বুঝে উঠে দাঁড়িয়ে এ দিক ও দিক তাকাতে লাগলেন।

এবার গিন্নির কড়া মন্তব্য শোনা গেল,—উঁ, আবার বাইস্কোপের ঢঙ ছ্যাখাইত্যাছে ছ্যাখ্‌ না।

কর্তা এবার মানে-মানে সংকুচিত হয়ে সরে বসলেন। গিন্নি দ্রুতবেগে মালা গণনায় মনোনিবেশ করে অপচিত সময়টুকুর ক্ষতি-পূরণ করতে লাগলেন।

গাড়ির ভেতর সমস্ত আবহাওয়াটা অত্যন্ত রুচিহীন বলে মনে হচ্ছিল। স্বজাতির প্রতি বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে উঠছিল। ট্রেনের বাইরে তাকালাম। খানিক আগের সেই প্রশান্ত সন্ধ্যালগ্ন, হিমেল হাওয়ার ঠাণ্ডা মধুর স্পর্শ কোথায় যেন উবে গেছে। মনে পড়ল একটি দিনের কথা। দিল্লী থেকে যাচ্ছিলাম আগ্রায়। এমনি সন্ধ্যা নেমেছে। পথের মাঝে ইঞ্জিনের গোলমালের জন্যে গাড়ি থেমে গেল কিছুক্ষণ। লাইনের ধারে পায়চারি করছি, মনে হল পাশের কামরায় একটি মহিলা গেয়ে উঠলেন। তাকিয়ে দেখি সেটি মহিলা-দেরই কম্পার্টমেণ্ট। গানের প্রথম কলিটি কানে এলো,

'কানাইয়া কানাইয়া ফুকারে যশোদা'

—মাতৃ মমতার সবটুকু স্নেহসুধা ঢেলে দিলেন তিনি গানের সুরে। দেখতে-দেখতে সম্পূর্ণ অপরিচিত অন্য মহিলাদের কণ্ঠও কেঁপে উঠল। প্রথমে মৃদু, তারপর বাঁধ-ভাঙা বন্যার স্রোতের মত স্নেহের প্লাবন বয়ে চলল।

গানটি বালকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা সম্বন্ধীয়। সম্ভবত ঐ অঞ্চলের বিশেষ পরিচিত সঙ্গীত ওটি।

দুধের গোপাল সেই কখন গোষ্ঠে গেছে। বেলা গড়িয়ে রোদের সোনা গাছের পাতায় শেষ পরশটুকু বুলিয়ে দিচ্ছে ; এখনও মায়ের গোপাল ফিরে এল না ঘরে। ধবলী কাজলী পায়ে-পায়ে ধুলি উড়িয়ে গোহাল অভিমুখে ফিরে আসছে। কিন্তু কই কানু, মায়ের আনন্দ দুলাল কানু আসে না কেন!

তাই মা যশোদার আকুল হৃদয়ের হাহাকার ভেসে চলেছে পথ-প্রান্তর পেরিয়ে—কানাইয়া-কানাইয়া-কানাইয়া। সে দিন সমস্ত

সান্ধ্য প্রকৃতি মাতৃ উৎকণ্ঠা আর বাৎসল্য রসে আকুল আর্দ্র হয়ে উঠেছিল। আজকের এই বিকৃত পরিবেশ রমণীহৃদয়ের সেই সুরটিকে ব্যঙ্গ করতে লাগল।

লক্ষ্ণৌতে এসে গাড়ি থামল। এবার গাড়ি বদলের পালা। নৈনীতাল এক্সপ্রেস ধরতে হবে। আমাদের সঙ্গে নামলেন বুড়ো কর্তা, গিন্নি আর সাঙ্গোপাঙ্গ। তোরঙ্গ-পেটরা, বোঁচকা-বুঁচকি টেনে নামাতে কুলিরা তো হিমসিম। এদিকে গিন্নির ধমক কারণে অকারণে। কোন বস্তুর ওপর কখন ফেটে পড়েন তার ঠিক নেই। ওঁরা নেমে এগিয়ে চললেন, আমরা পেছন-পেছন চললাম মনে-মনে ওঁদের নমস্কার ঠুকতে-ঠুকতে।

মাতাজী, মাতাজী—পেছন ফিরে দেখি আমাদের কামরার সেই দুটি বোনের একটি দ্রুত এগিয়ে আসছেন, হাতে রয়েছে তাঁর বুড়ো গিন্নির গঙ্গাজলের কুঁজোটি। আমাদের পাশ কাটিয়ে মেয়েটি এগিয়ে গেলেন। গিন্নির কাছে গিয়ে কুঁজোটি তুলে ধরে বললেন, মা ইয়ে কুঞ্জা ক্যায়া আপকা হ্যায়? আপ ইয়ে গাড়ীমে ছোড় আয়িথি।

কুঁজো পেয়ে গিন্নির নৃত্য দেখে কে! কর্তার অক্ষিযুগলের ওপর এবার কড়া মন্তব্য চলতে লাগল। মেয়েটি ফিরলেন কামরার দিকে। শ্রদ্ধায় মনটা ভরে উঠল। মুখোমুখি হতেই হাত তুলে নমস্কার জানালাম। সহাস্যে প্রতি নমস্কার জানিয়ে ভদ্রমহিলা ফিরে গেলেন কামরায়।

শিল্পী মন্তব্য করলেন, তাড়কা যে কেবল গর্জনে পারঙ্গমা তা নয় হে, অপগুণগুলি এমনিভাবে অর্জন করেছে যে ওর সঙ্গ অচিরেই বর্জন করা ভাল।

এবার শিল্পী পা বাড়ালেন। এক-এক বারে দেড় স্টেপ করে পা ফেলে আমরা নৈনীতাল এক্সপ্রেসের অভিমুখে এগিয়ে চললাম।

# শৈলনন্দিনী নৈনীতাল

‘চারিদিকে শৈলমালা

মধ্যে নীল সরোবর, নিঃস্তব্ধ নিরালা

স্ফটিক নির্মল স্বচ্ছ ; খণ্ড মেঘগণ

মাতৃস্তন পানরত শিশুর মতন

পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি ;—’

ভোরের হাওয়ার ছোঁয়া পেয়ে যখন গাড়ির ভেতর উঠে বসলাম তখন সঙ্গী এক ডাক্তার ভদ্রলোক সুপ্রভাত জানিয়ে বললেন, সামনের স্টেশনই কাঠগুদাম ; অর্থাৎ রেল-যাত্রার এখানেই যবনিকা।

কাচের সার্সি তুলে দিয়ে তাকালাম। চারদিকে নীল উষার আয়োজন চলেছে। শ্যামল পাহাড়ের গায়ে রাতশেষের পাতলা কুয়াশার চাদরখানা জড়ানো। কাঠগুদামে নৈনীতাল এক্সপ্রেস এসে থামল। এবার পর্বতারোহণ-পর্ব। যথানিয়মে লাইন দিয়ে বাসের টিকিট কাটা হল। আপাতত নৈনীতাল অভিমুখে যাত্রা শুরু, তারপর কোথায় সারা হয় কে জানে !

বাস চলেছে অরণ্যসঙ্কুল তরাই-অঞ্চলের পাশ দিয়ে। একদিকে পাহাড়ের গায়ে অরণ্যের আচ্ছাদন, অন্য দিকে গিরিখাদ। গাড়ি উঠছে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ওপরে, খাদও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে চলেছে। তরাই-অঞ্চল শাল ও জংলা লতা গাছে আকীর্ণ। বসতি বিরল। মাঝে-মাঝে পাথরের দেয়াল-ঘেরা ছোট-ছোট দু-চারখানা বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। বাড়ি-সংলগ্ন এক-এক টুকরো ক্ষেত। গাড়ি উঠছে আরও ওপরে। পরিচ্ছন্ন পথ। উঠতি পথের

ডাইনে স্থানে-স্থানে প্রাচীরের রক্ষাবেষ্টনী। উত্তর প্রদেশ সরকারের পথ-সংরক্ষণের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

তরাই-অঞ্চলের ওপরে সঙ্কীর্ণ ভাবর-অঞ্চল। পাহাড়ের পর পাহাড়। সঞ্জীববাবুর ভাষায়, বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। তবে কুমায়ুনের পাহাড় বড় বেশী বিক্ষিপ্ত। এ দিকে ও দিকে শৃঙ্খলাহীন সৈন্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কখন উপত্যকার শুরু, আবার অসম পাহাড়ের ওঠা-নামা। গিরিনদী কোথাও বয়ে চলেছে, অবশ্য বর্ষার দাক্ষিণ্য ছাড়া প্রায় নদীই বিত্তহীন। তাই কুমায়ুনে নিদাঘদিনে জলকষ্টের চরম।

ভাবর-অঞ্চলের স্থানে-স্থানে ছোট পার্বত্য স্টেশন। গাড়ি এসে সেখানে থামছে কিছুক্ষণ। ছবির মত রঙীন বাড়ি কোথাও; সম্ভবত ঐ অঞ্চলের সরকারী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের ডেরা। মাঝে-মাঝে বন্য চেরীর গাছ। ফিকে গোলাপী রঙের কুসুমস্তবকে সারা গাছ ভরে আছে। যেন পাহাড়ী খুশির খই ফুটেছে।

শিল্পী যাত্রাপথে ড্রাইভার-সাবকে বলে গাড়ি থামালেন। বন্য চেরীর লোভ সত্যিই সামলানো দায়। ফটো নিলেন একটি, দুটি —তিনটির আয়োজন করতে গিয়েই হর্ণের আওয়াজে পাততাড়ি গুটিয়ে গাড়িতে এসে বসতে হল।

বললাম, বুনো চেরীর প্রেমে পড়লেন নাকি?

শিল্পীর প্রত্যুত্তর শোনা গেল, কথাটা আমায় না শুনিয়ে, শুনিও একবার তোমার বৌদিদিকে। তারপর তন্ময় হয়ে বললেন, সত্যি এ যেন রাগবতী শৈলসূতা; শুধু প্রেমে পড়া নয় হে, পাগল হবার জোগাড়।

গাড়ি এখন চার-পাঁচ হাজার ফিট ওপরে উঠে এসেছে। চীর গাছের অরণ্য। নগাধিরাজ হিমালয় যেন বহির্দ্বারে অসংখ্য সৈন্য-সমাবেশ করেছেন। মাঝে-মাঝে দুর্ভেদ্য অরণ্যব্যূহ। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানযুগে অজেয় কিছুই রইল না। দুর্গম তুষারগিরি, দুষ্প্রবেশ্য অরণ্য, প্রকৃতির সুরক্ষিত দুর্গের একে-একে পতন হচ্ছে। কিন্তু এ

জয়ের গৌরবের মাঝে রক্তে বিজয়ের সে আনন্দদোলা নেই কেন? সব পেয়েও সবকিছু হারাবার হাহাকারে অন্তর আজ ভরে উঠেছে। যাযাবর বেদুইন মন বলছে—যন্ত্রের জয়ে তোমার অশান্ত অন্তরের অনির্বাণ অগ্নিটি নিস্তেজ স্তিমিত হয়ে এসেছে। এবার দীপনির্বাণের পালা। উদ্যম-আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি।

সপ্তম শতাব্দীর কুমায়ুন; দুর্ভেদ্য অরণ্যব্যূহ, মত্ত হস্তী, হিংস্র হায়না, বিষধর সর্পের লীলাভূমি। পথিক চলেছেন, পরিব্রাজক মহাভিক্ষু হুয়েন সাঙ। পদব্রজে পার হয়ে চলেছেন, 'গোবিসেনা,' তরাই আর ভাবরের অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্য রাজ্য। আরও-আরও-আরও উর্ধ্বে শৈলশৃঙ্গ 'ব্রহ্মপুরে' যেতে হবে। কুমায়ুনের তুহিনশীর্ষ শৈলরাজ্য ব্রহ্মপুর। আশ্রয়হীন সন্ধ্যা নেমেছে আরণ্যক বিভীষিকা বহন করে। শ্রান্তি-ক্লান্তি-ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে এসেছে দেহ, তবু থামলে চলবে না। সীমিত জীবনকালের প্রতি দণ্ড প্রতি পল যে মহামূল্য বহন করছে। প্রাণভরে দেখে নিতে হবে, মনের শ্রবণ পূর্ণ করে অসীমের আলাপন শুনতে হবে। থেমে গেলেই হারাতে হবে সেই পরমধন। বিচিত্র পৃথিবীর পরম প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তাই দেহ পথের ধূলায় আশ্রয় চাইছে, রূপাভিসারী মন বলছে,—

'মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধী'

সর্বত্র মধু ঝরছে। অমৃতলোকের সন্ধানে এসে থেমে গেলে কেন, চল এগিয়ে যাই। এই আশ্বাসই পথিকের একমাত্র পাথেয়। দীর্ঘ চলার পথে দেশ দেখব, মানুষজন দেখব, আর দেখব ঐশ্বর্যময়ী প্রকৃতি। কিন্তু মানুষের সে আকাঙ্ক্ষার অগ্নি আজ নির্বাপিত হতে চলেছে। বিজ্ঞানের প্রসাদে কেদার-বদরী-মানস-কৈলাসের পথ আজ হয়ে উঠেছে সহজগম্য।

কুমায়ুনের প্রারম্ভিক পর্বে মানুষ দুর্গম শৈলারোহণ করেছে

পদব্রজে। তারপর ধীরে-ধীরে তৈরি হয়েছে পার্বত্য পথ। ঘোড়ায় টেনেছে টাঙা, মানুষে বহন করেছে ডাণ্ডী; তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে একেবারে আমূল পরিবর্তন। সুগঠিত রাজপথের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে যন্ত্রযান। মানুষের সময় ও শ্রম হয়ে এসেছে সংক্ষিপ্ত।

প্রায় সাত হাজার ফিট উর্ধ্বে বাইশ মাইল দুর্গম পথ পেরিয়ে নৈনীতালে এসে পৌঁছতে লাগছে মাত্র একঘণ্টার কিছু বেশী সময়।

নৈনীতালের কাছাকাছি বাস এসে গেছে। লেকের ছবিটি মনের আনাচ কানাচ থেকে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। রেলওয়ে প্রচার-বিভাগের কল্যাণে-দেখা সেই ছবি, শ্যামল শৈলঘেরা লোকের সুনীল জল, বুকে তার শ্বেত রাজহংসের মত সফেদ রঙের পাল-তোলা নৌকোর সারি।

বাস এসে থামল একেবারে লেকের ধারে। এবার শুভদৃষ্টির পালা। আকুল প্রত্যাশার দৃষ্টি মেলে দিলাম সামনে। কিন্তু একি!

"And is this—Yarrow ?—*This* the Stream
Of which my fancy cherished,
So faithfully, a waking dream ?
An image that hath perished !"

বোধকরি সকল কল্পনা এমনি করে বাস্তবের দ্বারে এসে থমকে দাঁড়ায়, প্রত্যাশা আহত হয়। তারপর মনের ক্যানভাসে কল্পনার রঙ-মাখানো ছবিটিকে তুলে ফেলতে হয় ঘষে মেজে। আবার চলে নতুন তুলির কাজ। বাস্তবের নব রূপায়ণ। আপাতত সে রূপ অঙ্কনের আগেই শিল্পীর ডাকে ফিরে চাইলাম। হোটেলওয়ালাদের এজেণ্ট আর কুলিরা ঘিরে ফেলেছে শিল্পীকে। এগিয়ে গেলাম। প্রত্যেকেই তখন তারস্বরে আপন-আপন হোটেলের মাহাত্ম্যকীর্তনে ব্যস্ত। এক-একটি হোটেলের ছবির ছাপ-মারা কাগজ, তার তলায় দক্ষিণার হার দেওয়া। বিলম্বে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা, তাই একেবারে কাছে যাকে পেলাম তার হাতেই আত্মসমর্পণ করলাম।

সামনেই হোটেল এলফিনস্টোন। দূর থেকেই হলুদ রঙের গ্রাউণ্ডে লাল হরফের সাইন বোর্ডটা জ্বল-জ্বল করছে। পা চালিয়ে চললাম।

মল রোডের ওপর আমাদের এই নতুন আস্তানাটি মন্দ নয়। সামনে লেক, পূর্ব তীর ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণে চওড়া পথ। ঐ পথের একটু ওপরেই হোটেল এলফিনস্টোন।

হোটেলের ম্যানেজার এক সুন্দরদেহী মার্জিত ভদ্রলোক। খানসামাদের অধিকাংশ গাড়োয়ালী ও নেপালী। হোটেলের কায়দাকানুন সব সাহেবী। সামনেই ফুলের কেয়ারী। এখন ভ্রাম্যমাণদের সিজিন, তাই কোন-কোন হোটেলে ইতিমধ্যেই 'তিল ঠাঁই আর নাহিরে'র নোটিশ টাঙানোর আয়োজন চলছে। ও দিকে এপ্রিল, মে, জুন আর এ দিকে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এই পাঁচটি মাস শৈলারোহীদের মরশুম। উত্তর প্রদেশের রিজার্ভ ফরেস্টে বাবা দক্ষিণরায়ের চেলাদের নিপাত করা অথবা উড়ন্ত বন্য মুর্গীকে শিকার করে হাতের টিপ পরীক্ষা করা, এসবের লোভ কোন্ শিকারীই বা সামলাতে পারেন! তাছাড়া মৎস্যশিকারে যাঁরা মাস্টার তাঁরা নৈনীতাল, ভীমতাল, খুরপাতালের তীরে-তীরে ঘুরে বেড়ান মালমশলা আর সাজসরঞ্জাম নিয়ে জলচর মীনের সন্ধানে। শক্তিমানদের নৈনীতালের চারিদিকে সু-উচ্চ শৈলশৃঙ্গগুলি আরোহণের জন্য আহ্বান জানায়। আর নৌবিহার করতে চান যাঁরা, তাঁরা লেকের উত্তর-দক্ষিণ যে-কোনো প্রান্ত থেকে নৌকো ভাড়া করে বিহার করতে পারেন। ঘণ্টায় মাত্র বারো আনা দক্ষিণা। লেকের চারদিকের পথ অশ্বারোহণের জন্য উন্মুক্ত। পতনের ভয় না থাকলে পনি স্ট্যাণ্ডে গিয়ে একটি মনোমত ঘোটক নির্বাচন করে নিজ-নিজ কুশলতা অনুযায়ী অশ্বটিকে চালনা করতে পারেন। এসবের আকর্ষণই সম্ভবত উত্তর প্রদেশ সরকারকে নৈনীতালে গ্রীষ্মাবাস নির্মাণ করার প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে।

হোটেলের রুম নম্বর তেইশ আমাদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট হল।

সারা হোটেলে দেখলাম বাঙালীর সংখ্যাই বেশি। মনে হচ্ছে বাঙালীর ঘরকুনো অপবাদটা নেহাৎই বানানো। আত্মপ্রসাদ হলেও বলতে কুণ্ঠা নেই যে বাঙালীর মত রূপদর্শী মন সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। তীর্থদর্শন-মানসে যে যাত্রা সেখানে অবশ্য রেলবিভাগকে অবাঙালীরা পুষ্ট করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আসমুদ্র হিমাচল শুধু চোখের দেখা দেখব, এমন ভ্রাম্যমাণের সংখ্যায় সম্ভবত শতকরা আশী জনই বঙ্গদেশবাসী।

বারোটা বাজল। খানসামা জানিয়ে গেল খানা তৈরি। আমরাও তৈরি হয়েই ছিলাম। ঢুকলাম সুপ্রশস্ত ডাইনিং হলে। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন, কাঁচের সার্সিতে রঙিন পর্দা ঝোলানো। পর্দার ফাঁক দিয়ে লেকের জল আর পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ঘরের এখানে ওখানে ফুলদানিতে ফুল রাখা হয়েছে। এক কোণে একটি সুন্দর রেডিও সেট। সম্ভবত দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছিল তখন। হোটেলে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রেকফাস্ট দিয়েছিল, তাই দেখে হোটেলের আহার সম্বন্ধে বিশেষ পুলকিত হয়েছিলাম। কিন্তু প্রাতরাশ আশাপ্রদ হলেও মধ্যাহ্নভোজে নিরাশ হতে হল। অন্তত ভোজনবিলাসী বাঙালীর মনস্কাম পূর্ণ হবার মত যথেষ্ট উপাদানের অভাব দেখা গেল।

ক্ষুণ্ণ মনে অনভ্যস্ত বিলিতি কায়দায় মাংসের হাড়ে কাঁটা ঠুকে রপ্ত হচ্ছিলাম, এমন সময় পেছন থেকে এক মহিলাকণ্ঠ শুনতে পেলাম, কি ভাই, আজই আপনারা এলেন নাকি ?

ফিরে চাইলাম। বাঙালী ভদ্রমহিলা ; সীমন্তিনী ভাববার উপায় নেই। পঁয়ত্রিংশোর্ধ্বে বয়েস বলেই মনে হল ; অত্যন্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি।

শিল্পী হেসে উত্তর করলেন, হাঁ, আজই ভোরের গাড়িতে পৌঁছেছি।

এবার আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, একেবারে শুকনো ভাত খাবেন কি করে ভাই। তারপর নিজেই খানসামাকে

খানিকটা ডাল দিয়ে যেতে বলে অন্য একদিকের টেবিলে চলে গেলেন। দেখলাম, সেখানে তিনি একটি ছোট মেয়েকে চেয়ারে ঠিকমত বসিয়ে দিচ্ছেন।

এক ধরনের মানুষ আছেন যাঁদের গোত্রই আলাদা। পুঁথিপত্র পাঠ করে তাঁদের মানবপ্রীতি কিংবা পরদুঃখকাতরতা শিখতে হয় না। পরকে আপন করার মন্ত্রটি তাঁদের স্বভাবগত। করুণাদি হলেন সেই শ্রেণীর মহিলা। নৈনীতালে থাকতে প্রাণ না চাইলেও শুধু করুণাদির সঙ্গ পাবার জন্যেই দু দিন বেশি থেকে যেতে হল।

করুণা গাঙ্গুলী পূব বাঙলার মেয়ে, তবে কলকাতাতেই কেটেছে এঁর কৈশোর যৌবন। বাবা ছিলেন পদস্থ সরকারী চাকুরে, এখন অবসর নিয়েছেন। করুণাদি শিক্ষিতা ও সুগায়িকা; ভায়েরা সবাই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বেচ্ছায় বিবাহের পথ পরিত্যাগ করে সঙ্গীত-সাধনাকেই তিনি জীবনের অবলম্বন করেছেন। পদাবলী আর অতুলপ্রসাদের গীতই তিনি গেয়ে থাকেন বেশির ভাগ সময়। ভ্রমণে তাঁর অসীম অনুরাগ। আসাম থেকে আরবসাগর, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা সর্বত্র তিনি বিচরণ করেছেন একাধিকবার। নিঃসঙ্গ ভ্রমণে তাঁর শঙ্কা নেই তবে এ যাত্রায় সঙ্গে এনেছেন অষ্টমবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কাবলুকে।

সন্ধ্যায় বসেছিলাম হোটেলের বারান্দায়। সেই যে কখন দুপুরে আহারের পর বেরিয়েছিলাম, সারাটা বিকেল ঘুরে বেড়িয়েছি পাহাড়ে-পাহাড়ে। এখানে নির্জন পরিবেশে বনবেষ্টিত গভর্নমেণ্ট হাউসটি দেখবার মত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রায় আট লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে চার বছরে এর নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে। অবশ্য অর্থ এবং সময়ের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য এমন কিছু না হলেও শৈলনিকেতন হিসেবে এর একটা আলাদা রূপ আছে। একে বঙ্গবীর, তার ওপর একদিনেই চার্চ, হাসপাতাল, স্কুল কলেজ করে বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়িয়েছি, এখন তার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলেছে। ক্লান্তিতে একেবারে অবসাঙ্গ। শিল্পীর

অবস্থাও সঙ্গীন। বসেছিলাম আরাম কেদারায়। সামনে লেকের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসছিল। শ্রান্ত দেহে লাগছিল বেশ। লেকের চারদিকে যেন দীপালীর আলোকসজ্জা। ও পারে নৈনীদেবীর মন্দির থেকে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ছোট-বড় নানা আকারের ঘণ্টা নানা সুরে বেজে চলেছে। সাঁঝের পাহাড় ধ্যান-মৌন; মেঘখণ্ডগুলি শৈলসংলগ্ন হয়ে আছে। সন্ধ্যায় বড় ভাল লাগছে এই শৈলঘেরা লেকটিকে।

এই যে ছিলেন কোথায় আপনারা এতক্ষণ? খানসামা দু বার ফিরেছে চা নিয়ে,—পাশে এসে দাঁড়ালেন করুণাদি।

চলুন ভেতরে, বাইরে এত ঠাণ্ডায় বসে থাকলে যে অসুখে পড়ে যাবেন ভাই!

গত দু দিনে করুণাদির কথা অমান্য করবার মত শক্তি হারিয়েছি। মুখে হাসি আর ভ্রাতৃ সম্বোধনের অস্ত্র থাকলে অবলীলায় বিশ্ব জয় করা যায়। অন্তত করুণাদি তার উজ্জ্বল উদাহরণ। বাইরে বসে থাকার প্রবল ইচ্ছা এই কল্যাণময়ী মহিলাটির আদেশের কাছে হার মানল। সবাই মিলে ঘরের ভেতর গিয়ে বসলাম।

খানসামা এবার চা নিয়ে এল। করুণাদি নিজেই আমাদের কাপে চা পরিবেশন করলেন।

পিসিমণির সন্ধানে ইতিমধ্যেই কাবলুচন্দ্র এসে হাজির হয়েছে। আমরা ওকে একটা কেক দিলাম।

অমনি কাবলু প্রশ্ন করে বসল, কেক কেমন করে তৈরি হয়?

মহা ফ্যাসাদ! কেক খেতে মজা লাগে, এটুকু অন্তত যিনি একবার কেক খেয়েছেন তিনিই জানেন, কিন্তু কেক-তত্ত্ব তো সবার জানার কথা নয়।

কাবলুচন্দ্র প্রশ্নটি আবার আমার দিকেই ছুঁড়েছে, কারণ আমিই ওর হাতে আদর করে কেকটি তুলে দিয়েছিলাম।

কেক তৈরির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমার মহাপাণ্ডিত্যকে কি করে

ঢাকা যায় তাই ভাবতে গিয়ে দুটি বার মাত্র কেক-কেক করেছিলাম, সম্ভবত অবস্থা বুঝে করুণাদিই শেষে পাদপূরণ করে ভ্রাতুষ্পুত্রের জ্ঞানবুভুক্ষা মেটালেন। কাবলু এবার বসে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল।

সম্ভবত নতুন আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছিল। করুণাদি বললেন, কাবলুটা একেবারে কাবলী। ওর প্রশ্নের জবার না পেলে সারাটা দিন আর কারো নিষ্কৃতি নেই।

শিল্পী বললেন, কৌতূহল উন্নতির সোপান। সুতরাং আপনার নির্যাতন সীমাহীন হলেও কাবলুর পক্ষ সমর্থন না করে পারছি না।

ইতিমধ্যে কাবলুচন্দ্র প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেছে। এবার বিষয়টি কিন্তু সে আমদানি করেছে ঘরের বাইরের থেকে। বিষয়টি অভিনব সন্দেহ নেই।

আচ্ছা পিসিমণি, এই লেকটা কি করে হল ?

করুণাদি এবার আমাদের দিকে তাকালেন। চোখে তাঁর দুষ্টুমির হাসি।

কিন্তু এবার আর হার মানছি না। উত্তরটা আগেই তৈরি হয়ে ছিল। বললাম, চুনা পাথর বর্ষার জলে গলে যায়। বহুদিন এমনিভাবে পাথর গলে এ লেকের সৃষ্টি হয়েছে, বিজ্ঞানীরা এমনি একটা ধারণা করেন।

শিল্পী আলোচনায় যোগ দিলেন, অনেকে আবার বলেন, আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের ফলেই নাকি এর সৃষ্টি। কারণ লেকের চারদিকের পাহাড়ের আকৃতি অনেকটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কটাহের মত। তাছাড়া গিরিগাত্রের কাল রঙের পাথরগুলো দেখেও তা মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

এবার করুণাদি হেসে ফেললেন, বললেন, কাবলু কিন্তু আপনাদের কথার একবর্ণও বুঝল না।

এবার কাবলুর দিকে তাকিয়ে নিজেই বলতে শুরু করলেন,

জানো কাবলু, মস্ত বড় এক দেশ নাম তার ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের উত্তরে অনেক-অনেক বছর আগে এক রাজা রাজত্ব করতেন, নাম ছিল তাঁর দক্ষ। রাজার একটি মেয়ে—যেমন রূপ তেমনি গুণ। মেয়েটিকে সবাই ডাকত সতী বলে। সেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। দক্ষ খুব ভাল বরের খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু হলে কি হয়, মেয়ে এদিকে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছে শিবঠাকুর ছাড়া কারো গলায় মালা দেবে না। মেয়ের কথা শুনে দক্ষ তো রেগে আগুন। তাঁর এমন গুণের মেয়ে কিনা পড়বে গিয়ে একটা ভিখিরির হাতে!

কিন্তু সতী কারো মানা না শুনে একদিন শিবের গলায় মালা পরিয়ে কৈলাসে স্বামীর ঘর করতে চলে গেলেন। এদিকে অপমানের শোধ নেবার জন্যে দক্ষ করলেন এক যজ্ঞের আয়োজন। সব দেবতাকে তিনি যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করলেন, কেবল বাদ দিলেন নিজের জামাই শিবকে।

এতে সতীর খুব অপমান হল।

তখন সতী বাপের বাড়ি ছুটলেন এর একটা বিহিত করতে। কিন্তু সেখানে গিয়েও তিনি বাপের মুখ থেকে স্বামীর নিন্দাই শুনলেন। পতিনিন্দা সইতে না পেরে সতী ঝাঁপ দিলেন যজ্ঞের আগুনে। এদিকে শিবঠাকুর খবর পেয়েই ছুটে এলেন পাগলের মত। তাঁর অনুচরেরা দক্ষের এতবড় যজ্ঞটাই পণ্ড করে দিলে। শেষে শিব সতীর দেহটি কাঁধে তুলে নিয়ে ফিরে চললেন কৈলাসে। যাবার পথে সতীর একটি চোখ এইখানে খসে পড়ল। চোখের একটি নাম হল নয়ন। এই নয়নের থেকে যে জল গড়িয়ে পড়ল, তার থেকে একটি সরোবর হয়ে গেল।

এখানে লেক বা সরোবরকে লোকে বলে 'তাল'। সেই থেকে লেকটির নাম হল নয়ন জলের সরোবর বা নৈনীতাল। আর ঐ যেখানে চোখ পড়েছিল, সেখানে একটি মন্দির হল, নাম তার নৈনীদেবীর মন্দির।

গল্প শেষ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে করুণাদি বললেন, বিজ্ঞানীদের মনে ধরল না বুঝি?

শিল্পী বললেন, বলতে কুণ্ঠা নেই, এই মুহূর্তে আমার কাবলুকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। এমন মিষ্টি গল্প শুনতে পেলে আমি কাবলু হতে রাজী আছি।

শিল্পীর কথায় সবাই হেসে উঠলাম।

করুণাদি বললেন, দেখুন, সূর্য যে অগ্নিপিণ্ড বই কিছু না এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। তাই বলে শিশুমনে সাত ঘোড়ার রথে চেপে সূর্যিঠাকুরের পৃথিবী প্রদক্ষিণের ছবিটি আঁকতে ক্ষতি কি? আমাদের দেশের চারদিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কত বস্তু কত স্থানকে নিয়ে কত শত আখ্যায়িকা গড়ে উঠেছে। সেইসব কথা গল্পের সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেরা পরিচিত হোক না ছেলেবেলা থেকে। তাতে বৈজ্ঞানিক চিন্তায় কোনো বিপর্যয় আসবে বলে মনে হয় না, বরং দেশের প্রাচীন লোকাচার, লোককথা সম্বন্ধে তারা অনেক কিছু জানতে পারবে।

বলতে-বলতে করুণাদি থেমে গেলেন। থেমেই আবার সেই অপরাজেয় হাসিটি হেসে বললেন, নাঃ, ভ্রমণে এসে গুরু কথায় মন ভারী করা নয়, এবার একটু হাল্কা সুরের আলাপ চলুক।

শিল্পী বললেন, আজ কিন্তু আপনার গলা ভেঙে যাবার কোনো অজুহাতই শুনব না, একটি পদাবলী শোনাতেই হবে।

বেশ রাজী আছি, বললেন করুণাদি, তবে একটি সর্ত। আজ তাহলে রেহাই পাবেন না কেউ। আপনাদের যার যা কর্মধারা তারই পরীক্ষা দিতে হবে আজ।

নীরবে আর বসে থাকা চলে না। তাই বললাম, কিন্তু দিদি, আমি যে নিরুপায়। শিল্পী না হয় ছবি এঁকে দেখালেন আর আপনি সুধাকণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, কিন্তু আমার অবস্থা—হংস মধ্যে বকো যথা।

করুণাদি আর কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, বক

হতে যাবেন কেন? আপনি তো বাক্যবীর। আচ্ছা ছাত্রদের আপনি কেমন করে পড়ান তার পরীক্ষা দিন তো দেখি। বই নেই বলবেন, এনে দেব সঞ্চয়িতা---তার থেকে একটা কবিতা পড়ে ব্যাখ্যা করুন।

বললাম, ছাত্রছাত্রী নইলে কি আসর জমে।

শিল্পী আমার শত্রু হলেন,—আমি আর করুণাদি না হয় আজকে তোমার ছাত্রছাত্রীর দলে নাম লেখালাম।

করুণাদি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে শিল্পীকে সমর্থন জানালেন।

নিষ্কৃতি যেখানে নেই সেখানে আত্মসমর্পণ ছাড়া পথ কি। অগত্যা স্টেজের অভাবে মেজের ওপর দাঁড়িয়ে টেবিলে হাত রেখে বক্তৃতা জুড়ে দেওয়া গেল।

প্রাচীন ভারতভূমির সঙ্গে বালী, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল, তারই ইতিবৃত্ত কি ভাবে একটি রম্য কাব্যকাহিনীর ভেতর দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন, 'সাগরিকা' কবিতাটি থেকে তাই ব্যাখ্যা করে চললাম। ভেবেছিলাম কিছুদূর এগিয়েই যবনিকা পাত করব, কিন্তু চেয়ে দেখি এঁরা দু জনেই মুগ্ধ শ্রোতার মত তাকিয়ে আছেন।

চন্দ্রের আকর্ষণে যেমন জোয়ার আসে, মুগ্ধ শ্রোতার আকর্ষণে তেমনি আসে কথার জোয়ার—শিক্ষক মাত্রেরই এ অভিজ্ঞতা আছে।

কথার পর কথা এগিয়ে চলল; কিন্তু অতিভাষণ করতে গেলেই আজ গান আর অঙ্কনের দফা নিকেশ হয়ে যায়, তাই পথিমধ্যেই বললাম, এবার অথৈ সাগরের জলে ডুবল রাজকুমারের রত্নভরা তরণী, সে তরী আর উঠল না। আমার কথাটি আপাতত এইখানেই ফুরল।

বসে পড়তেই করুণাদি হঠাৎ প্রশ্ন করে আমায় একেবারে অবাক করে দিলেন, কিন্তু সাগরিকার সঙ্গে রাজকুমারের পুনর্মিলনের কথাটি তো বললেন না?

বুঝলাম কবিতাটি করুণাদির কণ্ঠস্থ হয়ে আছে।

রসিকতা করে বললাম, এ ভারটা কিন্তু আপনার ওপর। ভাব-সম্মিলনের পদ গেয়ে আপনিই না হয় রাইমাধবের মিলনটা ঘটিয়ে দিন।

করুণাদি বললেন, নাঃ, দেখছি আপনি টিপিক্যাল গুরু-মশায়। ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে কি করে কাজ করিয়ে নিতে হয় তা আপনি জানেন বিলক্ষণ।

শিল্পী করুণাদির দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার দিন আপনার পাঠ।

করুণাদি কিছু সময় চুপচাপ বসে কি ভাবলেন; তারপর বললেন, দেখুন, ভাবসম্মিলনে শ্রীমতী রাধা ছিলেন একা, মাধব কিন্তু আর আসেন নি। কানুগতপ্রাণা শ্রীমতী কেবল ধ্যানেই তাঁকে লাভ করেছিলেন। তাই এ পরিবেশে ও পালা গাইতে মন চাইছে না। তার চেয়ে শ্রীরাধার বর্ষাভিসারের প্রস্তুতির পদটিই গাওয়া যাক।

গান ধরলেন,—

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

ঘোর ঘনঘটায় বর্ষালগ্ন আসছে, তা বলে প্রিয়তমের কাছে অভিসারযাত্রা তো বন্ধ হয়ে যাবে না। সেই দুর্যোগ নিশীথে কণ্টক-ভরা পথেই যে চলবে শ্রীমতীর অভিসার।

তাই সে দুঃখযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন শ্রীরাধিকা। গৃহাঙ্গণে কলসীর জল উজাড় করে দিয়ে পিচ্ছল করেছেন মৃত্তিকা; তার ওপর বিছিয়ে দিয়েছেন কণ্টক। এবার কানু অনুরাগিণী কৃষ্ণনাম জপ করতে-করতে চলেছেন সেই দুর্গম পথে। কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পদতল কিন্তু সে যে শতদলের শোভা ধারণ করেছে।

গায়িকা গেয়ে চলেছেন। কণ্ঠের কম্পনে কথাগুলি রূপ হয়ে

চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। মনে হচ্ছে বিজন পথে মুখর ধারাপাতের ভেতর দিয়ে আকুলা রাধা এগিয়ে চলেছেন শ্রীমাধবের কুঞ্জ অভিমুখে ; আমরা বিদ্যুতের চকিত দীপ্তিতে সেই চিত্রটি ক্ষণে-ক্ষণে দেখতে পাচ্ছি।

করুণাদির গান থামল কিন্তু সুর থামল না। প্রাণের পর্দায় তার রেশটুকু বার-বার ফিরে-ফিরে আসতে লাগল।

গান থামিয়েই করুণাদি বললেন, এবার শিল্পীর পরীক্ষা।

সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পী তাঁর শয্যায় ওপর থেকে একটি প্যাড তুলে ধরে বললেন, এই নিন, পরীক্ষাতে বসতে না বসতেই উত্তর লেখা হয়ে গেল।

করুণাদি আর আমি ঝুঁকে পড়লাম শিল্পীর হাতে-তুলে-ধরা প্যাডটির ওপর। আশ্চর্য, গানের ফাঁকে কখন শিল্পী পেনের আঁচড়ে অপূর্ব একটি ছবি এঁকে ফেলেছেন।

ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি বসে রয়েছেন আসনে। পুষ্পাভরণে-ভূষিতা পার্বতী তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছেন প্রণতি। কবরী থেকে তাঁর অসংলগ্ন দু-একটি করুবক কুসুম স্খলিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে।

শিল্পীর চিত্রের সঙ্গে আমি বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু মনে হল করুণাদি অভিভূত হয়ে পড়েছেন। সেই যে একদৃষ্টিতে ছবিখানি দেখেছেন আর চোখই তুলছেন না।

শেষে চোখ যখন তুললেন তখন দেখলাম মুখে তাঁর মুগ্ধ বিস্ময়ের ছাপ। ছবিখানি নিয়েই তিনি নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তারপর আবার সেই স্বাভাবিক হাসি হেসে বললেন, দেখুন, খানিক পরেই তো পার্বতীকে প্রত্যাখ্যানের বেদনা বহন করে ফিরে যেতে হবে। তখন সান্ত্বনা দেবার সঙ্গিনী তো চাই। তাই সে কাজটা আমিই না হয় বেছে নিলাম। আপাতত পার্বতী আমার সঙ্গেই থাকুন।

শিল্পী বললেন পার্বতীর সঙ্গিনীটিকে তাহলে যে সখীর কুসুম অলঙ্কারগুলি খুলে ফেলার অপ্রীতিকর কাজটুকু করতে হয়।

তাছাড়া অগ্নিতপস্যা, হিমতপস্যা—সর্বত্র সখীর অনুগামিনী হতে হবে। দুঃখের দিনে দূরে সরে গেলে তো আর চলবে না।

করুণাদি কপট নৈরাশ্যে বললেন, ছবির তলায় বড় বেশি মূল্য বসাচ্ছেন শিল্পী। এত দামে কি দরিদ্র ক্রেতা কিনতে পারে?

শিল্পী হেসে বললেন, ক্রেতার সে অভিরুচি!

আলোচনা জমে উঠছিল কিন্তু সামনে মূর্তিমান রসভঙ্গের মত এসে দাঁড়াল খানসামা।

করুণাদির দিকে তাকিয়ে বললে, মাতাজী, অব্ হী খানা ভেজ দুংগা?

জরুর, বলেই করুণাদি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, উঠে পড়ুন, আর দেরী করবেন না যেন।

সবাই এবার ডাইনিং হলের দিকে চললাম। যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, তের নম্বর ঘরের ভেতর আসতে আপত্তি আছে না কি?

কি যে বলেন দিদি, বললাম সকৌতুকে। পর্দা ঠেলে ঢুকলাম ভেতরে। ফুল দিয়ে ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। ঢুকতে-ঢুকতেই বললেন তিনি, দেখুন, আমরা ভারতবাসী না হয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছি কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষগুলো যে এখনও অথৈ অন্ধকারে। সেদিন কাগজে পড়লাম, য়ুরোপের কোন একটা দেশে নাকি অপয়া তের নম্বরটাকে একেবারে ধারাপাত থেকে বাদ দিতে চাইছে। ঘরের বা রুমের নম্বর তের দেখলেই ভাড়াটেরা একেবারে অ্যাবাউট টার্ন। তাই বারোর পরে একেবারে লাফ দিয়ে চৌদ্দর কোঠায় চলে যাচ্ছে। বাহাদুরী আছে বলতে হয়।

ইতিমধ্যে দু জন খানসামা চার জনের খাবার করুণাদির ঘরে এনে হাজির করল।

আমরা তো অবাক। ব্যাপার কি?

করুণাদি খাবারগুলো টেবিলের ওপর সাজাতে-সাজাতে বললেন, তের নম্বর ঘরে খেতে আপনাদেরও আপত্তি আছে নাকি?

শিল্পী একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, কিছু মাত্র না, ডাইনিং হল একটা পাবলিক প্লেস। সেখানে এমন মেজাজ পাওয়া যাবে কি করে।

খেতে বসলাম। কিন্তু এত আয়োজন—কি ব্যাপার! এবার কিন্তু করুণাদিকে বলতে হল, এবার বুঝলাম এসব কার কীর্তি।

শিল্পী অনুযোগ করলেন, নেমন্তন্ন তো করতে হয়। এমন দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করেছেন জানলে তো পূর্বাহ্লেই প্রস্তুত হয়ে থাকতাম। এ আপনার অবিচার।

এবার ধমক খেতে হল, খান তো আপনারা এখন।

কাঁটা-চামচ তুলতে যাচ্ছি দেখে উনি ওগুলো সরিয়ে রেখে বললেন, ভাই আমরা হচ্ছি বাঙালী, লুটেপুটে খাওয়াই আমাদের অভ্যেস। ওসব সাহেবী অস্ত্রগুলো আজকের মত না হয় একটু মরচেই পড়ুক না।

এবার প্লেটের ওপর সাজানো ভোজ্যবস্তুর দিকে হাত বাড়ালাম।

এমনি আনন্দে হাসি গল্পে আমাদের ছুটির দিনগুলো কেটে যেতে লাগল।

ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ি। কোনোদিন প্রায় ন হাজার ফিট উঁচু চীনাপিকের ওপর থেকে দেখা যায় রোহিলাখণ্ড, কুমায়ুন-গাড়োয়ালের ধূমল ধূসর পার্বত্য অঞ্চল। দেখা যায় যমুনা নদীর উৎসমুখ থেকে কালীনদের কূল পর্যন্ত শুভ্র দীর্ঘ তুষারমৌলি। কোন এক দুপুরে অল্‌মা শৈলে উঠে ভ্রম হয়, পায়ের তলায় বুঝি পাথর সরে যাচ্ছে, যেমন সরে গিয়েছিল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। তিন দিন ক্রমাগত বারিবর্ষণের ফলে কেঁপে উঠেছিল অল্‌মা শৈল। এক সময় খসে পড়ল তার একাংশ ; আর তার পেষণে চূর্ণ হয়ে গেল মন্দির মানুষ—যা পড়ল অবতরণের পথে।

অপরাহ্নে মল্লিতালের বাজারে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানোর একটা

কৌতুক আছে। নানা রঙের পোষাক-পরা মানুষজন ঘুরে ফিরছে। কেনাকাটা খরিদ বিক্রি চলছে। পাশেই সিনেমা হলের থেকে হিন্দী গান ভেসে আসছে; তার সাথে স্বর মিলিয়ে গাইছে কয়েকটি পাহাড়ী সহিস ছেলে। পাশেই তাদের ঘোড়াগুলো ঘাস চিবিয়ে খাচ্ছে।

এমনি ঘুরতে-ঘুরতে শিল্পী একদিন আবিষ্কার করলেন একটি শৌখিন যষ্টির দোকান। এক বৃদ্ধ নিবিষ্ট মনে ছড়িতে নক্সা তুলছিলেন। আমরা পথিকজন যে দোকান-ঘরে ঢুকে পড়েছি সে খেয়াল নেই তাঁর; এমনি তন্ময় হয়ে বৃদ্ধ শিল্পী আপন কর্ম করে যাচ্ছিলেন।

এক সময় চমক ভাঙতেই বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন ভেতরে। সেখানে প্রায় দু-তিন শ ছড়ি তৈরি হয়ে বিক্রির অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা হরেক রকম নক্সা-কাটা ছড়ি তুলে-তুলে দেখতে লাগলাম। কোনোটির হাতলে বাঘের মূর্তি, কোনোটিতে হাতি বা হরিণের মুখাকৃতি। হাল্কা বর্ণবিলেপন থেকে খোদাই মূর্তিগুলির সর্বত্র বৃদ্ধ শিল্পীর অদ্ভুত দক্ষতা ও রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া গেল।

কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম—এই বৃদ্ধ ছড়িতে নক্সা তোলার ব্যাপারে উত্তর প্রদেশ সরকারের কাছ থেকে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। নৈনীতালে এসে একটি সত্যিকারের শিল্পকর্ম দেখা গেল।

কুমায়ুনের বিভিন্ন পার্বত্য শহরগুলির বাজারে-বাজারে ঘুরে দেখেছি, পাহাড়ীদের তৈরি আঞ্চলিক কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য এখানে বড় একটা মেলে না। মাঝে-মাঝে পালক গোঁজা এক ধরনের রঙীন জুতো আর পাতলা নরম পালকের কুশন দেখা যায় বিক্রি হতে। কুমায়ুন অঞ্চলে কাঠের কাজ মোটামুটি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এই পার্বত্য অঞ্চলের মুষ্টিমেয় মুসলমান-শ্রেণী তাঁতের কাপড় প্রভৃতি বুনে থাকে। তামার তৈরি এক ধরনের ঘড়াও

এখানে পাওয়া যায়, তবে আকৃতির দিক থেকে সেগুলিকে কোনো-মতেই প্রশংসা করা চলে না। এ বিষয়ে হরিদ্বারের কর্মকারদের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয়।

নৈনীতালের উত্তর-দক্ষিণে লেকের চারদিক ঘুরে এলে প্রায় আড়াই মাইল পথ ভ্রমণ করা হয়। পূবে মলরোডের ওপরেই কেবল পিচ-ঢালা পথে রিক্সো চলে। লেকের পশ্চিম তীর ঘেঁষে যে পথ, সেটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। অশ্রুমতী উইলো আর চীনারের পাড়-ঘেরা লেকের ঐ প্রান্ত দিয়ে যেতে-যেতে কখনো মুখোমুখি এসে পড়বে একদল পাহাড়ী রমণী। হাতে তাদের পূজার উপকরণ, গলায় হাসলী আর চৌনিয়া। কানে ঝুলছে গাদোয়ারী। নাকে ছোট-ছোট আংটির মত ফুলি আর বড় বালার আকারে নাথ্‌লি। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে দেখা হলেই তাদের হঠাৎ লজ্জা এসে পড়বে; অমনি মুখখানাকে ঢেকে নেবে ঘোমটায়, নয় তো উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে শরম রাখবে। তারপর এগিয়ে যাবে নন্দাদেবীর মন্দিরের দিকে। শ্রাবণে ঐ মন্দিরের চারদিকে চলবে উৎসবের ঘটা।

নন্দাদেবীর মেলা কুমায়ুনের একটি বিশেষ পর্ব। আলমোড়া, রাণীক্ষেত, নৈনীতালের সর্বত্র মেলা বসবে। নাচে গানে তখন শৈলপুরী কুমায়ুনকে ভ্রম হবে ইন্দ্রের অমরাবতী বলে।

তল্লীতালের বাজারের ওপার থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলাম। পাইনের পাতায়-পাতায় সাঁঝের আঁধার রাতের বাসা বাঁধছিল। দূরে যতদূর দেখা যায় আঁধারে কুয়াশায় একাকার। পূব দিকে একঝাঁক জোনাকীর আলো ঝিলমিলিয়ে উঠছে না! পথচারীকে শুধোলাম, বলতে পার ভাই দূরে ও কিসের আলো?

ভাওয়ালীর বাবুজী।

ভাওয়ালী! উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত টি. বি. স্যানাটোরিয়াম। পথের প্রান্তেই শিল্পী আর আমি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। মনে হল যেন কয়েকটি জীবনের দীপ চারদিকের চাপ-চাপ অন্ধকারকে

প্রাণপণে সরিয়ে আপন অস্তিত্বটুকু বজায় রাখবার জন্য চেষ্টা করে চলেছে।

মৃত্যুর মত ঘন অন্ধকার নিভিয়ে দিতে চায় ঐ ক্ষুদ্র প্রাণ-বর্তিকাগুলি—তবু প্রাণের দীপটুকু জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে কি গভীর আকুলতা!

যাবে না? শিল্পী বললেন।

চলুন, উত্তর করলাম।

শিল্পী আবার কথা বললেন, এখন আর ওখানে যাওয়া যায় কি করে বল, কাল সকালেই যাই চল।

আমি বাসায় ফেরবার কথাই ভাবছিলাম কিন্তু শিল্পী ভাবছিলেন ভাওয়ালী যাবার কথা।

হোটেলের পথে যেতে-যেতে বললাম, কি হবে বলুন ওখানে গিয়ে, অবশ্য টি.বি.র বিভীষিকা আমার নেই, তবে কাল হোক পরশু হোক যখন আলমোড়া যাব তখন ভাওয়ালী তো পথেই পড়বে।

মনে হল শিল্পী যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। শেষের পথটুকু নির্বাক চলেছেন দেখে সন্ধি করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে বললাম, কাল ব্রেকফাস্টের পর না হয় ঘুরেই আসি একবার ভাওয়ালী থেকে। নতুন জায়গায় একটা আলাদা স্বাদ পাওয়া যাবে।

সন্ধির প্রস্তাবে খুশি হলেন শিল্পী। আমার হাত ধরে বললেন, এই তো চাই, কলকাতায় থেকে রাতদিন তো ভাই হিসেব নিকেশ করে যাচ্ছি, এখানে চলার পথে আর হিসেব কেন। যখন যেখানে খুশি—'বাধার বিন্ধ্যাচল' পার হয়ে—'শুধু ধাও শুধু ধাও নাহি ফিরে চাও'—তারপর যখন কলকাতায় ফিরব তখন বরাতে তো 'পুনর্মুষিকো ভব'—বিধিলিপি খণ্ডায় কে।

পরের দিন ট্যাক্সি ভাড়া করে ভাওয়ালীর পথে রওনা হলাম। তখন কি জানতাম যে আমাদের সামনে এক বেদনার ইতিহাস আবিষ্কারের অপেক্ষায় পড়ে আছে।

দশটা বাজে—ট্যাক্সিতে এসে পৌঁছলাম ভাওয়ালীতে। নৈনীতাল

থেকে সাত মাইল। পাহাড় ও অরণ্যে স্থানটি মনোরম। এক অপরিসর নীলধারা বয়ে চলেছে উপলের পাশ কাটিয়ে এঁকে বেঁকে। পাহাড়ের গায়ে এ দিক ও দিক ছড়ানো ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের কতগুলি কুটির। টি.বি. রোগীদের আস্তানা। উন্মুক্ত প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য এখানে—আলো বাতাসে মুক্তির স্বাদ। প্রধান চিকিৎসক এখানে প্রকৃতি। স্থানের মাহাত্ম্য মনের সব দুর্ভাবনা, দুঃখচিন্তা মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়।

ডাকবাংলোতে গিয়ে ওঠাই স্থির হল। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে কয়েকটি চা ও ফলের দোকান—আর ভাওয়ালীর পোস্ট অফিস।

কয়েকটি কমলা ও আপেল কেনা হল, দুটো রুটিও নিয়ে নিলাম। তারপর সিধে চললাম ডাকবাংলোতে। বাংলোয় পৌঁছে কিন্তু ঘরে থাকতে মন চাইল না। কিপারের জিম্মায় আমাদের ছোটখাট দু-একটা জিনিস রেখে আবার বেরিয়ে পড়লাম পাহাড়ী পথে।

এ দিক ও দিক ঘুরে বেড়ালাম উদ্দেশ্যহীন। শিল্পী ডজনখানেক ছবি তুললেন। একটি টিলার ওপর বসে রুটি বের করে খেতে লাগলাম। পাশেই চিরগাছের অরণ্য। ঝিরি-ঝিরি পাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে পড়েছে। অরণ্যদেবীর হিরণ্য অঞ্চল স্খলিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। মনে হল এই পরিবেশটি যেন আমাদের জন্য যুগ-যুগ ধরে প্রতীক্ষা করেছিল। না হলে এখানে এসে প্রাণ এমন করে কথা কয়ে উঠছে কেন।

এই রৌদ্রধৌত দিন—অরণ্য বিটপীর সঙ্গীত, এই উপলমুখর শীর্ণ স্রোতস্বতী আর সু-উচ্চ শীলাসন—এরা আমাদের সুদূর কর্মভূমিতে প্রকৃতির নিমন্ত্রণ-লিপিটি এমন করে পৌঁছে দিয়ে আসে কেন? আর সেই ডাকে চিরাভ্যস্ত সুনির্দিষ্ট জীবনের সীমারেখা অতিক্রম করে আমরা বেরিয়ে পড়ি সাংসারিক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে দুঃখযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সেই নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে।

শিল্পী কথা কইলেন, আমার কি মনে হয় জানো, মনে হয়

শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের পেছনে ছিল কৈকেয়ীর আশীর্বাদ! সেই অযোধ্যার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকাণ্ড কর্তব্যপালনের স্বর্ণশৃঙ্খলে কুমার কিশোর বাঁধা পড়বেন চিরদিনের মত, তার চেয়ে এই সুখময় আরণ্যক জীবন যে অনেক বেশী কাম্য। তাই রাজমুকুট আর কুমারের শির অবধি পৌঁছল না, অভিষেকবারি কমণ্ডলুতেই রয়ে গেল, রাজকুমার চললেন বনবাসে। সবাই জানল কৈকেয়ীর কুচক্রান্ত, কিন্তু শ্রীরাম পেয়ে গেলেন পরম প্রসাদ। এমন বনে থাকতে পেলে রাজপ্রাসাদ যে ভাই সোনার পিঞ্জর!

মনে হল, হিন্দুশাস্ত্রকারেরা চতুরাশ্রমের বানপ্রস্থ পরিকল্পনায় গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। পারিবারিক জীবনের বন্ধন মুক্ত হয়ে মানুষ লাভ করবে প্রকৃতির সান্নিধ্য, যে প্রকৃতির সঙ্গে তার অযুত নিযুত বৎসরের সম্বন্ধ সেই সম্পর্কবন্ধনকে সে নতুন করে অনুভব করবে, পরমাত্মীয় বলে স্বীকার করে নেবে।

চল ফেরা যাক—

এবার দু জনে ফিরে চললাম রেস্ট-হাউসে। রেস্ট-হাউসে পৌঁছতেই কিপার এসে জানালো ওপারের পাহাড় থেকে কোন্ এক কটেজের মেমসাব নাকি আমাদের আসার কথা শুনে দু বার খোঁজ করে গেছেন।

বেশ একটু অবাক লাগল। এমন একেবারে অপরিচিত ভূমিতে কে আবার আমাদের খোঁজ নেয়! শিল্পীর দিকে তাকিয়ে দেখি একেবারে সবিস্ময় কৌতূহলে থমকে আছেন।

কিপারকে বললাম, চিনিনে বাপু তোমাদের ঐ কটেজ, নিয়ে চল, কিছু বকশিস করা যাবে।

এবার কিপারের অনুসরণ করে আমরা পাহাড়ী পথে ওঠা-নামা করতে-করতে চললাম।

মিনিট সাত-আটেক ওঠা-নামা করে আমরা এসে পৌঁছলাম একটি কুটিরের সামনে।

পরিবেশটি মনোরম। কয়েকটি চীর গাছের মাঝে ছবির মত

কুটিরটি। সামনে মরসুমী ফুলের বেড। গৃহের মুখ উদয়ভানুর দিকে। প্রথম সূর্যের আলো ঋজুভাবে এসে পড়ে এর আঙিনায়। কয়েকটি ছোট-বড় ঘর মিলে এই কটেজ। রোগীর ঘর থেকে অল্প দূরে গৃহস্বামিনী থাকেন।

গাইড আমাদের এনে তুলল একেবারে গৃহকর্ত্রীর ডেরায়।

আমাদের পায়ের সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা। কিপার যখন বুঝিয়ে দিলে যে এঁরাই সেই বাঙালী দুটি ভদ্রলোক যাঁদের তিনি রেস্ট-হাউসে খোঁজ করেছিলেন, অমনি সহাস্যে এগিয়ে এসে হাত তুলে বললেন, নমস্তে।

প্রতি নমস্কার জানালাম। এবার তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর বসবার ঘরে। কয়েকটি কেদারা পড়ে আছে, টেবিলের মাঝখানে ফুলদানীতে ফুল সাজানো। এক কোণে একটি বুক-সেল্ফ। আমাদের বসতে ইঙ্গিত করায় আমরা চেয়ারে বসলাম। এবার আমাদের দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, চা আনব, না কফি? বললাম, যা খুশি আপনার।

ভদ্রমহিলা ঘরের ভেতর চলে গেলেন। ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করতে না পেরে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম।

ঘরের দেওয়ালে লক্ষ্য পড়ল, যিশুখৃষ্টের নানা বয়সের কতকগুলি ছবি টাঙানো রয়েছে। ঘরের কোণে বুক-সেল্ফের ওপর স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করানো একটি শিশুমূর্তি। গৃহে সজ্জার বাহুল্য নেই তবে সামগ্রীগুলি যথাস্থানে বিন্যাসে গৃহস্বামিনীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

খানিক বাদে একটি নেপালী বয় টেবিলে চা-বিস্কুট পরিবেশন করে গেল। কিছুপরেই গৃহকর্ত্রী ঘরে ঢুকলেন।

আমরা উৎসুকদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি মৃদু হেসে বললেন, আপনারা নিশ্চয়ই কিছুটা অবাক হচ্ছেন, কারণ এখনও আমি আমার আসল বক্তব্যটুকু আপনাদের কাছে বলতে পারিনি।

একটা চেয়ার টেনে তিনি আমাদের মুখোমুখি বসলেন। তারপর বলতে লাগলেন, বাঙলা দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা করব বলে আমি আজ পাঁচটি বছর ধরে চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, ভাওয়ালীতে কোন বাঙালীকে এর ভেতর থাকতে দেখলাম না।

বললাম, তা সম্ভব, সবাই আলমোড়ার পথে বাস থেকে নেমে ভাওয়ালীতে দু-দশ মিনিট ঘুরে যা একটুখানি দেখে নেয়, তারপর আবার বাসে করে ফিরে যায়। ভাওয়ালীতে তাই থাকার বড় একটা প্রশ্ন ওঠে না।

ভদ্রমহিলা বললেন, সে কথা ঠিকই। তবে মানুষের প্রয়োজন সে যুক্তি মানতে চায় না। তাই আজ আপনাদের এখানে পেয়ে মনে হল যেন আমার প্রয়োজনেই যিশু আপনাদের সঙ্গে আজ আমায় মিলিত করলেন।

মনে-মনে সেজন্যে যিশুকে ধন্যবাদ দেব কি-না তাই ভাবছিলাম, কারণ আসল কথা এখনও আমাদের শোনা হয়নি।

ভদ্রমহিলার স্বরে এবার যেন একটু পরিবর্তন দেখলাম: আপনাদের আজ এখানে পেয়ে আমি যে কারণে নিজেকে দায়মুক্ত মনে করছি তাই এখন বলছি শুনুন। বলতে লাগলেন ভদ্রমহিলা, আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে এক অপরাহ্ণে একটি ভদ্রলোক হঠাৎ আমাদের সামনের লনে এসে দাঁড়ালেন। তখন আমি বাগানের কাজ করছিলাম। মুখ তুলতেই ভদ্রলোক সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমি আমার এই ঘরে কোন অসুস্থ রোগীর থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি কি-না।

বললাম, ভাওয়ালীর স্যানাটোরিয়ামের সীমার বাইরে আমার এই ঘর, এখানে আমি যাঁদের রেখে থাকি তাঁরা রোগমুক্তির ঠিক পরেই স্বাস্থ্যলাভের জন্য এখানে এসে থাকেন। অসুস্থ রোগীদের জন্য এ ঘর ভাড়া দেওয়া হয় না, ক্ষমা করবেন।

আমার কথার কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা ভেবে আমি কথা বলিনি, কিন্তু কথা শেষ করে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে

দেখলাম যেন মুহূর্তে তাঁর মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গেল। অপরাহ্ণের পড়ন্ত রোদে তাঁর করুণ চোখের চাউনি আমার কাছে বড় অসহায় বলে মনে হল। মনে পড়ল আমার হারানো একমাত্র সন্তানের রোগপাণ্ডুর মুখখানি। অমনি মনে কি তোলপাড় হয়ে গেল জানি না, যা কোনো দিন ভাবিনি তাই করে বসলাম। যুবকটির হাত ধরে বললাম, যিশু থাকতে ভয় কি বাবা, তিনি যেমন করে হোক তোমায় একটি আশ্রয় জুটিয়ে দেবেন।

আমার এ ধরনের আচরণ হয়তো আগন্তুক আশা করেনি, তাই প্রথমে সে খানিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আমার পেছন-পেছন সে পাশের ঘরে এসে ঢুকল।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আমার বক্তব্য দীর্ঘ করে আমি আপনাদের সময় নষ্ট করছি, মাপ করবেন সেজন্যে। তবে যে কারণে আজ আপনাদের এখানে ডেকে আনলাম সে কারণটুকুই বলি।

যুবকটি আমায় তার কোনো নাম ঠিকানা দিতে স্বীকার করেনি। শুধু বলল, সে বাঙালী, আর আমি যদি তাকে আরও কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি তাহলে সে সোজা আমার সন্তান বলেই দাবী করে বসবে।

যুবকটির এই দাবীও আমায় মেনে নিতে হল। মাঝে-মাঝে ওকে শুধু বলতে শুনতাম, ডাক বিলিকার কখন আসবে মা? আমার নামে কি কোনো চিঠি এসেছে? মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত তার এই চিঠি পাওয়ার উৎকণ্ঠা মেটেনি। সে দিনও সে আমার কাছে ডাকবিলিকারের খোঁজ করেছে যথারীতি।

কথা-কটি বলেই ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন ভেতরে। একটু পরে নিজেই একটি স্যুটকেস এনে মেঝের ওপর রেখে বললেন, এ ভার আমি আর বইতে পারছি না। আপনারা বাঙালী, এর থেকে আমাকে মুক্তি দিন।

স্যুটকেসটি ভদ্রমহিলা খুলে দেখালেন। আমরা মেঝের ওপর

বসে তাই দেখতে লাগলাম। কয়েকটি গরম জামা-কাপড় বই ছাড়া মূল্যবান বিশেষ কিছু ছিল না তার ভেতর।

শিল্পী সুটকেসের পকেটে হাত দিয়ে টেনে আনলেন দুখানি ভাঁজ-করা কাগজ। ঝুঁকে পড়ে আমরা দেখতে লাগলাম সেগুলো, যদি কোনো ঠিকানার হদিস পাওয়া যায়। খুলে দেখলাম, দুখানি ঠিকানাহীন পত্র। গভীর ঔৎসুক্যে শিল্পী ও আমি তা পাঠ করতে লাগলাম। একটি চিঠি পুরীর সমুদ্রসৈকত থেকে লেখা। সম্ভবত এখানে আসার আগে ভদ্রলোক কিছুকাল সেখানে থেকে থাকবেন।

সমুদ্রসৈকত, পুরী

আজ সামনের সাগর বড় কথা কইছে। বোধহয় চাঁদের কলা পূর্ণ হল। ডাঙার ওপর নুলিয়াদের যে বড় নৌকোটায় আমি ঘর বেঁধে আছি, তার সামনে কারা যেন কানাকানি করছে, কখনো বা খলখল খুশিতে ফেটে পড়ছে। আমার ছোট জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছি। নীলকান্তমণির মত নীলসাগর। একটা ঢেউএর পেছনে আর-একটা ঢেউ, তার পেছনে আরও আরও, ঠিক যেন একদল জলপরী নাচের ভঙ্গীতে এগিয়ে আসছে, খোঁপায় তাদের অজস্র সাদা-সাদা ফেনার ফুল গোঁজা।

খানিক দূরে বালুর জমীনে নুলিয়াদের দুটি কিশোর-কিশোরী; মনে হয় বালু দিয়ে পিরামিড গড়ছে। কিশোরীটি মনে হচ্ছে চপলা। ঝিনুক বসিয়ে ছেলেটি যে-ই এক-একটি পিরামিডের অলংকরণ শেষ করছে, অমনি মেয়েটি খিল-খিল করে হেসে তাদের ভেঙে দিচ্ছে। আচ্ছা, চাঁদপুরের কথা তোমার মনে পড়ে না? কাকুর সঙ্গে সেই যে আমরা শিকারে যেতাম। খাঁড়ির কাছে আমাদের থাকতে বলে কাকু এগিয়ে যেতেন সমুদ্রের দিকে। আমরা কেয়া গাছগুলোর আড়ালে লুকোচুরি খেলতাম। এক-এক সময় কাকু মুখে আঙুল রেখে দূর থেকে আমাদের ইশারা করতেন।

আমি চুপ করে গেলেও তোমার খুশি কিছুতেই থামতে চাইত না। শেষে শাড়ীর আঁচল মুখে পুরে হাসি চাপতে।

হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ শোনা যেত। চমকে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতাম, যেন কয়েক শত শ্বেতকমল আকাশগাঙে ভেসে যাচ্ছে। মত্ত হাতীতে যেন তাদের মৃণালগুলো ছিঁড়ে দিয়েছে। একদিন একটি হাঁস আমাদের সামনে ঝরা ফুলের মত পড়ে গিয়েছিল, তুমি চোখে হাত ঢেকে কাঁদছিলে। কাকু এসে তোমায় কত আদর করে বোঝালেন, মনে আছে তোমার সেসব দিনের কথা? আজ এক-এক করে আমার সব কথাই মনে পড়ছে। আকাশে আজও ঝাঁক-ঝাঁক পাখী আল্‌পনা আঁকছে। ঐ তো দূরে বালুচরে ঝিনুক কুড়োচ্ছে সেই দুটি কিশোর-কিশোরী। তুমি একবারটি এখানে এলে কি যে ভালোলাগায় পেয়ে বসবে তোমায়! ছবির মত মনে পড়বে আমাদের হারানো দিনগুলি।

তুমি এলে এই ছোট্ট সুন্দর নৌকোর ভেতর বসে মুলিয়াদের কেরোসিনের বাতি জ্বেলে আমরা কথা কইব, যে কথার খেই হারিয়ে যাবে যখন তখন। গান গাইবে তুমি—যে নৌকো উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় ভেসে চলেছে, তারই গান। আমি শুনব, শুনতে-শুনতে মনে-মনে কত নামহীন দরিয়া পার হয়ে যাব।

স্বপ্নের মত কেটে যাবে রাত। শেষে রাত পোহাবে আর সমুদ্রের হিমেল হাওয়ার পাখায় ভর দিয়ে আসবে ভোর। অমনি তুমি ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে। সংসার ফেলে এসেছ, আমি কেমন করে তোমায় স্বার্থপরের মত থাকতে বলি। এই যে ক্ষণিক সঙ্গ দিলে এর মূল্য শোধ দেব কেমন করে। তোমার যাবার বেলা ভারী হয়ে উঠবে মন, তবু তোমায় হাসিমুখে বিদায় দিতে হবে।

তুমি চলে যাবে বালুর জমীনে পায়ের চিহ্ন এঁকে-এঁকে। তোমার চলে যাওয়ার পরে আমি খুঁজব তোমার পায়ের চিহ্নগুলি, মনে হবে তুমি তখনও রয়েছ সাগরকূলে কোথাও। এক সময় আমাকে আমার ছোট্ট আস্তানায় ফিরে আসতে হবে। নৌকোয় বসে-বসে

কেবল প্রার্থনা জানাব ঝড়ের দেবতার কাছে, যেন দু-চার দিন তাঁর আবির্ভাব না হয়। নইলে তাঁর মাতামাতিতে বালু উড়তে থাকবে আর সঙ্গে-সঙ্গে মুছে যাবে তোমার পায়ের চিহ্নগুলি। * * *

এই অবধি এসে চিঠিখানা থেমে গেছে। প্রাপকের কাছ অবধি এ চিঠি পৌঁছয়নি। কারণ চিঠির উল্টো পাতায় দু-চার ছত্র সংযোজন—তাতে এই কটি কথা লেখাঃ মনের কথা ছাড়া পায় আখরে। সেই আখরের আলপনাটুকু একটি মনকে তুলে ধরে অন্য একটি মনের কাছে। আজ সেই মনের কারিকুরিটুকু তোমার কাছে পৌঁছে দিতে পারছি না, এর চেয়ে শাস্তি আর কি আছে বল তো? তোমার নতুন ঠিকানা না পেলে এ চিঠি পাঠাতে পারব না---এ চিঠি কেন, কোন চিঠিই না।

এর পর আর-একখানি চিঠি দেখলাম। চিঠিখানি নাতিদীর্ঘ। তারিখ দেখে বোঝা গেল প্রথম পত্ররচনার প্রায় এক মাস পরে দ্বিতীয়টি রচিত হয়েছে। এখানা কুমায়ুনের শৈলপুরী থেকে লেখা।

ভাওয়ালী

মুক্তি আমার আলোয়-আলোয় ঐ আকাশে। আকাশ কেমন নীল আর কত উজ্জ্বল। কিছু আগে দেখলাম এক আনন্দময় পুরুষ নেমে এলেন ও পারের থেকে। ফল-পটিতে নেমে কিছু ফল কিনলেন। চোখে মুখে আর প্রশস্ত ললাটে তাঁর সূর্যের আলো যেন চন্দন মাখিয়ে দিয়েছে। কি নিবিড় প্রশান্তি তাঁর। ছোট একটি পাহাড়ী ছেলের সঙ্গে তিনি হেসে কথা কইলেন, তারপর অবলীলায় উঠে চলে গেলেন পাহাড়ে। তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। অসীম প্রাণের জোয়ার আমার বুক ঠেলে উঠল। মনে হল আমি একেবারে সুস্থ হয়ে গেছি। মনে হল, যে ঝাড়ুদার সামনের উঠোন পরিষ্কার করতে এসেছে সে এখুনি আমায় বলবে, আপনাকে আজ বেশ ভাল দেখছি বাবুজী, অনেক সেরে উঠেছেন আপনি। মরশুমী ফুলগুলো হাসছে। সর্বত্র আনন্দ, সর্বত্র প্রাণ। এমন দিনে

আমার মুক্তির খবর নিয়ে তোমার লিপিখানি কি আসবে না? * * *

লিপি অবশ্য এসেছিল। সেই সীমাহীন ব্যথায়-ভরা আর-একটি হৃদয়ের করুণ লিপির খবর পেলাম খৃষ্টান মহিলাটির কাছ থেকে। ওর মৃত্যুর দশ-বার দিন পরে পুরীর স্ট্যাম্প-মারা একখানি চিঠি অনেক ঘুরে এসেছিল। সে চিঠিখানাও তিনি ঘরের ভেতর থেকে নিয়ে এলেন।

বললেন, চিঠিখানা খুলেছিলাম কিন্তু কোনো ঠিকানা পাওয়া গেল না।

পড়লাম সেই চিঠি। যাকে উদ্দেশ্য করে সে চিঠির প্রতি অক্ষর গাঁথা হয়েছে, যদি আত্মার অস্তিত্ব থাকে তাহলে তিনি তা শুনেছেন নিশ্চয়ই। চিঠিখানি সবটুকু পড়ার প্রয়োজন নেই। কয়েকটি ছত্রে এক অব্যক্ত বেদনার স্পর্শ মাখানো।

* * * আজ বারে-বারে মনে পড়ছে সেলকার্কের সেই সীমাহীন আর্তি, Have I the wings of a dove!

আজ যে কেন এমন বুকভরা বেদনা তার কোনো ঠিকানা পাচ্ছি না বাউল। এখন দুপুরবেলা, সংসারের কাজের পাট চুকিয়ে এসে বসেছি চিলে কোঠায়। চারদিকে একটা কাজ-ফুরোনো অবসরের ঢিলে-ঢালা ভাব। মনটা চাইছে সকল বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে ছুটে যেতে তোমার কাছে, দু দণ্ড চোখের দেখা দেখে আসতে। কিন্তু জীবন কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সে কৃপা করে না কৃপার পাত্রকে।

সেই যে ময়লা গাড়ীর কর্কশ শব্দে এই অন্ধ গলির দিনের সূচনা হয়েছিল, তারপর একে-একে কত বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গ উঠে এখানকার বাতাসকে ঘোলাটে করে তুলেছিল। এখন আর তার কোন চিহ্ন নেই, কেবল ঐ নীল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত একটা চিলের তীক্ষ্ণ কান্নায় কেঁপে-কেঁপে উঠছে। আমার বুক ঠেলে যে আজ সেই কান্না উপছে পড়তে চাইছে বাউল! * * *

পড়ছিলাম চিঠিগুলি। যে রোমান্সের গন্ধ পেয়ে অনেক সময়

ভাববিলাস বলে মনে করেছি, আজ এই বিশেষ অবস্থায় তার চরম সত্য ও পরম পীড়াদায়ক রূপটি দেখলাম। সমস্ত মনটাই যেন আনন্দমুখর জগত থেকে মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

সুটকেসটি তুলে নিলাম। সম্ভব হলে বারাণসীর গঙ্গায় এটি ভাসিয়ে দিয়ে যাব। ফিরে আসছিলাম, পেছন থেকে ডাক দিলেন মহিলাটি। আবার ফিরলাম। উনি নিজেই নেমে এলেন। তারপর হাতের মুঠো থেকে শিল্পীর হাতে কয়েকটি টাকা ও একটুকরো কাগজ দিয়ে বললেন, আমায় উনি যে টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে ওঁর খরচ বাদে এই টাকাগুলো বেঁচেছিল, অনুগ্রহ করে এগুলি নিয়ে যান।

কাগজের টুকরোটি খুলে দেখলাম তাতে পাই পয়সার নিখুঁত হিসেব লেখা। এমনকি মুমূর্ষুর ইচ্ছে অনুযায়ী দাহ করবার খরচ-টুকুও নেওয়া হয়েছে।

সমস্ত চৈতন্য যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। সেই কর্তব্যনিষ্ঠ মহিলাটিকে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে তাড়াতাড়ি রেস্ট-হাউসের পথে পা বাড়ালাম।

আবার সেই উচ্চাবচ উপলাস্তৃত পথ ভেঙে চলেছি। চীর গাছের পল্লবে-পল্লবে বাতাস বইছে। এখন আর আনন্দের সংগীত বলে মনে হচ্ছে না, যেন একটানা একটা বুক-চাপা কান্না আর দীর্ঘশ্বাস। কারো মুখে কথা নেই। শিল্পী হঠাৎ চলার পথে থমকে দাঁড়ালেন।

বললেন, মনে পড়ে তোমার সেই কবিতাটি ?

কেন এই আনাগোনা     কেন মিছে দেখাশোনা
দু'দিনের তরে,
কেন বুকভরা আশা     কেন এত ভালবাসা
অন্তরে অন্তরে।
বসিয়া আপন দ্বারে     ভালোমন্দ বল তারে
যাহা ইচ্ছা তাই,

অনন্ত জনম মাঝে গেছে সে অনন্ত কাজে
সে আর সে নাই।
আর পরিচিত মুখে তোমাদের সুখে
আসিবে না ফিরে
তবে তার কথা থাক্ যে গেছে সে চলে যাক্
বিস্মৃতির তীরে॥

রদ্দুরের রঙ পাল্‌টেছে। বেলা অবসানের ইঙ্গিত। রেস্ট-হাউসে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এলাম গাড়িতে। গাড়ি আবার চলল নৈনীতালের পথে গড়িয়ে। ধীরে-ধীরে ভাওয়ালী পেছনে মিলিয়ে গেল। প্রাণদবতার উদ্দেশ্যে মনে-মনে প্রার্থনা জানিয়ে বললাম, হে মঙ্গলময়, জীবনের যে দীপগুলি নিভু-নিভু হয়েছে, তোমার অমৃত করস্পর্শে তাদের উজ্জ্বল অক্ষয় করে দাও প্রভু!

সন্ধ্যায় ফিরলাম নৈনীতালে। হোটেলের বারান্দায় বসেছিলেন করুণাদি। কাছাকাছি হতেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন, এত দেরী হল ফিরতে? সেই গেছেন সকালে আর ফিরলেন এই সন্ধ্যা শেষ করে! কাল সকালেই না ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নৈনীতাল?

একাই অনেকগুলি কথা বলে গেলেন তিনি।

বললাম, কিছু আবিষ্কার করে এনেছি দিদি।

কলম্বাসের আবিষ্কার না আর-কিছু, হাসলেন তিনি।

শিল্পী বললেন, তার চেয়ে বেশি না হলেও কিছু কম নয় জানবেন।

হাতমুখ ধুয়ে তাহলে সিধে চলে আসুন আমার ঘরে, আপনাদের আবিষ্কারের গল্প শোনা যাবে।

গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে বেশবাস ছেড়ে করুণাদির ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

সান্ধ্য চা-পর্ব চলল কিছুক্ষণ।

কই আপনাদের আবিষ্কারের গল্প বললেন না তো? করুণাদি সাগ্রহে বললেন।

শিল্পী পকেট থেকে তিনখানা চিঠি বের করে তাঁর হাতে দিলেন।

বাংলা হরফে চিঠি দেখে করুণাদি বললেন, এ আবার কি?

বললাম, আমাদের আবিষ্কার।

এবার চিঠিতে মনঃসংযোগ করলেন। তিনখানা চিঠি পড়া শেষ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, চোখে মুখে জিজ্ঞাসাচিহ্ন এঁকে।

বললাম, কি মনে হচ্ছে?

একটি নিঃসঙ্গ যুবকের উদ্ভ্রান্ত প্রেমের পরিচয়, আর তার প্রেমিকার প্রত্যুত্তর। কোথায় পেলেন এ বস্তু?

কাহিনীটুকু সবিস্তারে বললাম। কতক্ষণ নির্বাক থেকে করুণাদি বললেন, মাঝে-মাঝে মনে হয় মানুষের সঙ্গ একটা অভিশাপ।

শিল্পী বললেন, হঠাৎ আপনার এমন একটা ধারণা হবার কারণ জানতে পারি কি?

একে ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয় মিঃ ব্যানার্জী, গভীর বেদনার সঙ্গে বললেন করুণাদি; মানুষের স্রোতের মাঝে যদি মনটাকে বাঁচিয়ে চলতে পারেন তাহলেই পরিত্রাণ, নইলে তিলে-তিলে অপার বেদনা বয়ে চলতে হবে।

বললাম, হাজার মনের মিছিলে মন বাঁচিয়ে চলা কি সম্ভব দিদি? কোনো এক অভাবিত মুহূর্তে একটি মন আর-একটি মনকে স্পর্শ করে যাবেই।

হেসে বললেন করুণাদি, সব মানি, তবুও বলব, বয়েস অনেক কম, অভিজ্ঞতাও অল্প ভাই; পথে-পথে আরও এগিয়ে যান তখন দেখবেন পাওয়া না-পাওয়ার দুঃসহ দ্বন্দ্বে জীবনটা পঙ্গু, ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

শিল্পী বললেন, কিন্তু জীবনের এই ক্ষতগুলি একদিন মধুর স্মৃতি-চিহ্ন হয়ে রইবে না কি ?

কিছুক্ষণ একেবারে নীরবে বসে রইলেন করুণাদি। তাকালুম তাঁর দিকে।

মনে হল মনের গভীরে কোথাও কিছু যেন হাতড়ে ফিরছেন তিনি। উদাস দৃষ্টি ডুব দিয়েছে স্মৃতির অতলে। এক সময় বললেন, আপনাদের সব কথাই ভাই মেনে নিলুম, তবু একটি কথা থেকে যায়।

একটু থেমে আরার বললেন, আচ্ছা, রবি ঠাকুরের 'বর্ষশেষ' কবিতাটি পড়েছেন নিশ্চয়ই।

মাথা নেড়ে জানালাম, পড়া আছে।

বললেন করুণাদি, এই ঝড়ের একদিকে ধ্বংসের তাণ্ডব, পুরাতন বর্ষবিদায়, আর অন্য দিকে নবীনের আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানেন, নবজীবনের মহা সম্ভবনাটুকুর জন্যে মনে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তার চেয়ে পুরাতনের বিদায়ব্যথা শতগুণ আঘাত হেনে যায়। সমস্ত ঝড়ের মাঝে আমি পরিচিত পৃথিবীর দূরে সরে যাবার একটা তীব্র হাহাকার শুনতে পাই। তাই দুঃখ পেতে-পেতে মনে হয় মানুষের সঙ্গ থেকে সরে আসি।

বললাম,চাইলেই কি সরে আসা যায় দিদি ?

তাই তো এত ক্রন্দন, এমন চাপা দীর্ঘশ্বাস, বললেন করুণাদি।

শিল্পী প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গেলেন, এখন বলুন তো এ চিঠিগুলোর কি সদ্গতি করা যায় ?

হেসে বললেন করুণাদি, দিয়ে দিন আমায়।

আপত্তি নেই, বললেন শিল্পী, কিন্তু তার পরের কথাটুকু শুনতে ইচ্ছে করে।

অর্থাৎ চিঠিগুলো নিয়ে আমি কি করব ? রেখে দেব কাছে।

বললাম, এই যে একটু আগেই বলছিলেন কোনো কিছু মনে ধরে রাখার বিপদ আছে। তাহলে এমন সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি কেন ?

বাব্বাঃ, একেবারে দু দিক থেকে সাঁড়াশির আক্রমণ চালালে আমি বেচারা একা পারব কেন। আচ্ছা না হয় হারই মানলাম, হেসে বললেন করুণাদি।

জানেন, যখন প্রথম কলেজে ঢুকি তখন একদিন কমন-রুমে জানলার ধারে বসে গুন-গুন করে গান করছি, এমন সময় সামনের গাছের একটি পাতা দমকা হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ল আমার কোলে। সেদিন সে পাতাটিকে ফেলে দিতে পারিনি; আমার গানের কথার সঙ্গে তার কোথায় যেন মিল ছিল, তাই তুলে রেখেছিলাম একটি বইএর ভেতর। আজও তাকে ফেলতে পারিনি। তাই তো বলছিলাম সঞ্চয়ের ব্যথা বড় তীব্র হয়ে বাজে।

এমনি কথায়-কথায় অনেক রাত্রি হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘরে এলাম। জিনিষপত্র গোছগাছ করতে যাচ্ছি এমন সময় এলেন করুণাদি। বললেন, আর বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই, উঠে বসুন।

তারপর নিজেই বাঁধাছাঁদার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্যে একটি নেপালী বয়কে ডেকে এনেছিলেন। আমাদের কোন কাজেই হাত লাগাতে দিলেন না।

শেষে আমাদের টিফিন ক্যারিয়ারটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, সম্ভবত নিজের ঘরে।

করুণাদির কোনো কাজে বাধা দেবার শক্তি আমরা অনেক আগেই হারিয়েছিলাম, তাই এবারও কোনো প্রতিবাদ তুললাম না।

কিছুক্ষণ পরে ফিরলেন তিনি। ঘরে ঢুকে যথাস্থানে টিফিন ক্যারিয়ারটি রেখে দিয়ে বললেন, রাণীক্ষেতে পৌঁছতে অনেক বেলা হয়ে যাবে ভাই, পথে কিছু খেয়ে নেবেন।

আজ আর কোন কথা বলার নেই। মনের গোপনে কোথায়

যেন একটি বেদনার কাঁটা বিঁধে আছে। তাকে তুলে দিই এমন সামর্থ্যও আজ হারিয়ে বসে আছি।

তিন জনেই নীরব। শুধু শিল্পীর সিগারেটটি থেকে একটা ক্ষীণ ধোঁয়া ওপরে উঠে যাচ্ছে ; মনে হচ্ছে কতকগুলো বেদনার বৃত্ত তারা রচনা করে চলেছে। কতক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভাঙল,

যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রিদল,
উঠেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ।

অকম্পিতকণ্ঠে ধীরে-ধীরে সবটুকু কবিতা আবৃত্তি করে গেলেন করুণাদি। কবিতাটি বলা শেষ হলে উঠে দাঁড়ালেন। মুখে চোখে একটি বেদনার হাসি টেনে বললেন, পথে-পথে নতুন জীবন, বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হোক আপনাদের, আজ পথের দেবতার কাছে করুণাদির এই কামনা রইল।

নিজের ঘরে চলে গেলেন তিনি, আমরা চেয়ে রইলাম তাঁর চলার পথের দিকে।

ভোর সাড়ে সাতটায় গাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে, তাই শয্যা নিলাম। সকালে উঠেই তাড়াহুড়ো লেগে গেল। হোটেলের বেয়ারা বাবুর্চিদের বকশিস মিটিয়ে বেরুতেই সাতটা বাজল। হোল্ডল আর সুটকেস কুলির মাথায় তুলে দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি চলে এলাম করুণাদির ঘরে। ঘরে তালা ঝুলছে। একেবারেই অসম্ভব। আমরা যাব অথচ করুণাদি ঘরে নেই। কিন্তু হোটেলের এ দিক ও দিক খুঁজে কোথাও তাঁর দেখা মিলল না। একটা নেপালী বয় বলল, করুণাদিকে সে নাকি ভোরে কাবলুর হাত ধরে বাইরে যেতে দেখেছে।

সত্যি মনটা বড় বেশি দমে গেল। কিন্তু একেবারেই আর সময় নেই, প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে হাজির হলাম বাস-স্ট্যাণ্ডে। লটবহর তুলে দিয়ে বাসে উঠে বসলাম। চোখ কিন্তু পড়ে রইল হোটেলের পথের ওপর। একবারও কি আর করুণাদির সঙ্গে দেখা

হবে না। কেনই বা তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা না করে বেরিয়ে গেলেন। হাজারো প্রশ্ন মনে ভীড় করে এল।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। সবকিছুই যথা নিয়মে ঘড়ির কাঁটার নির্দেশ চলেছে, মনের আকাঙ্ক্ষার দাম সেখানে নেই। গাড়ি বেরিয়ে গেল পথে।

কিছু দূরে গিয়ে শিল্পী প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐ যে করুণাদি।

দেখলাম, কাবলুর হাত ধরে পথের ধারে একটি চীর গাছের তলায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

নিষ্পলকে তাকিয়ে রয়েছেন আমাদের গাড়ির দিকে।

ঝড়ের বেগে গাড়ি বেরিয়ে গেল। মিলিয়ে গেলেন করুণাদি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে, সম্ভবত চিরদিনের মতই।

## ॥ রূপবতী রাণীক্ষেত ॥

'আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান।'

কবে কোন এক রাণীর শখ হয়েছিল কৃষাণী সাজতে। অমনি রাজার আদেশে রাণীর জন্য তৈরি হল ক্ষেত। তার উপর রাণী ছড়িয়ে দিলেন বীজ। তার থেকে জেগে উঠল চিকণ সবুজ গাছ। ধান জাগল, গম জাগল আর ফুটল হরেক রকম ফুল। হয়তো বা সে দিন থেকে নাম হল তার রাণীক্ষেত। অবশ্য সে রাণী আজ আর নেই, তবু রয়ে গেছে তার একটুকরো কামনা। রাণীর কতক করের ছোঁয়া লেগে আজও তায় সোনা ফলছে।

এসব অবশ্য গল্প কথা, বাস্তবের হাওয়া লাগলে কোথায় হারিয়ে যাবে সব। তবু ভালো লাগছিল বেশ। চীর গাছের অচল অরণ্যের ভেতর দিয়ে রাণীক্ষেতের পথে যেতে-যেতে গল্প শুনছিলাম শিউপ্রসাদের মুখ থেকে। বার কি চোদ্দ বছরের কিশোর শিউপ্রসাদ। লক্ষ্ণৌর এক বাঙালী বাবুর বাড়ী কাজ করে সে। ছুটি নিয়ে দেশে চলেছে। রাণীক্ষেত থেকে হাঁটা পথে যেতে হবে আরও পনের বিশ-মাইল পথ; তারপর তার গাঁ—তার মা ভায়েদের দেখা মিলবে সেখানে।

পথে আসতে গরমপানি স্টেশনে গাড়ি থেমেছিল কিছুক্ষণ। শিল্পীর গলা গরমপানির আশায় অনেকক্ষণ থেকেই কাতর হয়ে পড়েছিল, এতক্ষণে সাধ মিটিয়ে গরমপানিতে গলা আর্দ্র করতে লাগলেন। পত্রকাথ পানে চিরদিনই আমার অনাসক্তি তাই পাহাড়ী নদী রাতিঘাটের শীতল নীলাভ জলের পানে তাকিয়ে অক্ষিতৃষ্ণা মেটাচ্ছিলাম; এমন সময় হুটোপুটির সাড়া পেয়ে

ফিরে তাকালাম। আমাদের গাড়ির ভেতরেই দুটো পাহাড়ী ছেলে-মেয়েতে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়েছে। আগে তো ওদের দেখিনি, কি ব্যাপার! জিনিষপত্রগুলো নিয়ে যদি চম্পট দেয়, তাই গম্ভীর মুখে তাড়া করে গেলাম, এ্যায়, ক্যায়া করতা হ্যায়?

আপন খুশিতে খেলা করতে-করতে হঠাৎ কোনো আওয়াজ পেলে যেমন থমকে থেমে যায় খরগোসগুলো, ঠিক তেমনি গাড়ির ভেতর তারা নিশ্চুপ হয়ে গেল। ক্ষুদে-ক্ষুদে খরগোস চোখে শুধু মিট-মিট করে তাকাতে লাগল আমার দিকে। ছেলেটির বয়স হবে বার কি চৌদ্দ, মেয়েটি আট বছরের বেশি নয়। মনে হল ভয় পেয়েছে মেয়েটি। মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। বৃষ্টি-ধোয়া মোলায়েম রোদটুকুর মত ভারি মিষ্টি লাগছিল ওর চেহারাটি।

গাড়ির কাছাকাছি হতেই ছেলেটি বলল, বাবুজী হামি রাণীক্ষেতে যাবে।

কথা শুনে ত তাজ্জব। ছোট একটি পাহাড়ী ছেলে বাংলা শিখল কোত্থেকে। আমাকে অবাক হতে দেখে ছেলেটি খুশিতে ভরে উঠেছে ততক্ষণে। এবার ওই বলে চলল, শিউপ্রসাদ হামার নাম আছে। হামি লক্ষ্ণৌমে বাঙালী বাবুকা কোঠিমে কাম করে। হামি বহুত আচ্ছা বাংলা সমঝতায়।

গাড়ির হর্ন বাজল। যাত্রীরা এসে বসল গাড়ির ভেতর। আমার দু পাশে বসল ছেলেমেয়ে দুটি। শিউপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়ে কোন হ্যায়?

হামারা বহিন, বাবুজী।

গরমপানির কাছে পিঠে কোথাও ওদের মামার বাড়ি। ভাই আসবে লক্ষ্ণৌ থেকে তাই বোনটি এগিয়ে এসেছে এত পথ।

ক্যায়া নাম হ্যায়? মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম।

একেবারে নিরুত্তর। মুখটি বরং আমার উল্টো দিকেই ফিরিয়ে নিলে সে।

শিউপ্রসাদ বলল, মুন্নি বাবুজী।

শিউপ্রসাদের কথা শেষ হতে না হতেই মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, নেহি নেহি বাবুজী, হামরা নাম মুন্নি নেহি, মুন্নিদেবী।

ও মুন্নিদেবী, বহুৎ আচ্ছা!

ছোট মেয়েটির নামের ওপর সম্ভ্রমবোধ দেখে হাসির তুফান উঠল গাড়ির ভেতর। মুন্নিদেবী ততক্ষণে এক কাণ্ড করে বসল। লজ্জা ঢাকতে সে আর-কোনো আড়াল হাতের কাছে না পেয়ে আমার লং কোটের ভেতর তার ছোট্ট মুখখানা ঢেকে ফেললে। সরল পাহাড়ী মেয়েটির কাণ্ড দেখে তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলাম।

এর পর থেকে সারা পথ ভাইবোনে বসল আমার গা জুড়ে। শিউপ্রসাদের খানিকটা ভদ্রতাবোধ আছে, তাই যতটা পারল সম্ভ্রম বজায় রেখে চলল; কিন্তু খোদ পর্বতকন্যাটি সে দিক থেকে একেবারে নির্বিকার। দাদার সঙ্গে খেলা করতে-করতে খুশিমত ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল আমার কোলের ওপর।

খয়র্‌না সেতুটি পার হয়ে গাড়ি চলল এগিয়ে। রাতিঘাট এসে মিলেছে কোশী নদীর সঙ্গে। এবার পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছে বাস, নীচে বয়ে চলেছে কান্তিময়ী কোশী। হরিদ্বার হৃষীকেশের নীলধারার মত স্বচ্ছ কাকনয়নী জলের প্রবাহ। শরতে কোশী শীর্ণা, তাতে যৌবনের রাগ নেই, তবে কৃশতনুর কান্তিটি ঢাকা পড়েনি। দুই কূলে ছোট-বড় মসৃণ চিক্কণ উপলখণ্ডের বিস্তার। এ অঞ্চলে কোশীই প্রধান নদী। কোশী ব্রিজের কাছে এসে গাড়ি থামল। সঙ্গী শিল্পী ছবি তুললেন কয়েকটি। ব্রিজের গায়ে লেখা রয়েছে ১৯২৩ সাল। গাড়ি পার হয়ে চলল কোশী নদী। কখনো পাহাড়ের উচ্চ শীর্ষের গা ঘেঁষে গাড়ি চলেছে, কখনো বা একেবারে পাহাড়-ঘেরা খণ্ড-খণ্ড সমতলভূমিতে নেমে চলেছে। কোনো কোনো পাহাড়ের গায়ে ধাপে-ধাপে সিঁড়ি কাটা রয়েছে। শিল্পী ওগুলির নাম রেখেছেন—স্বর্গের সিঁড়ি। আসলে ওগুলি হল পাহাড়ী ক্ষেতিকারদের হাতের-তৈরি ক্ষেত। পাহাড়ের থেকে যেসব ঝর্ণা

বা জলের ঢল নেমে আসে, ওরা বাঁধ দিয়ে সেই জল সঞ্চয় করে রাখে এক জায়গায়। ওখান থেকে প্রয়োজনমত ছোট-ছোট ধারায় একধাপ থেকে অন্য ধাপে জল চালান করে। এইভাবে ওদের কৃষিক্ষেতে জল সরবরাহের কাজ চলে। মেয়ে পুরুষে সবাই মিলে ওরা চাষের কাজ করে। কুমায়ুনে ধান, গম আর আলু হল প্রধান উৎপন্ন ফসল। তবে কুমায়ুনের চাল খেয়ে সুখ পাওয়া যায় না। দেরাদুনের চালের মত পয়লা নম্বরের বাসমতি চাল এখানে বড় একটা মেলে না। চলতে-চলতে এক জায়গায় গাড়ি এসে থামল। পাহাড়-ঘেরা সমতল ভূমি। গাড়ি থামল আর আমরাও নামলাম। ড্রাইভার বলল, গাড়ি এখানে খানিক সময় সারাই চলবে। কথাটা শুনে কিন্তু ভালোই লাগল। কলকাতায় অফিস-টাইম হলে এতক্ষণে একটা কুরুক্ষেত্রই ঘটে যেত। বেচারা কণ্ডাক্টরের জল্দি-জল্দি হিসেব মিলিয়ে পয়সা নিকলাতে হিমসিম খেতে হত। কিন্তু এখানে ওসব বালাই-ই নেই। অফিস-যাত্রার সেই পক্ষীরাজ মনটি এখানে একেবারে তার পাখাদুটি গুটিয়ে নিয়েছে। অপরিচিত জায়গায় একটুখানি এ দিক ও দিক ঘুরে বেড়ানোর ফুরসত পেলে বর্তে যাই। হাঁটতে-হাঁটতে আমরা চলেছি, এগিয়ে। কণ্ডাক্টরকে বলে রেখেছি, বাপু হে, চল্‌তি পথে কৃপা করে আমাদের তুলে নিও। ভুল করে যদি ফেলে যাও তাহলে কুমায়ুনের শেরই শেষটায় সাবড়ে দেবে।

কথা শুনে নেপালী কণ্ডাক্টরের ক্ষুদে চোখদুটি আরও ক্ষুদে হয়ে এল। বদন ব্যাদন করতেই বেরিয়ে পড়ল এক জোড়া শিখর-দশন। আশ্বস্ত হয়ে হেঁটে চললাম গাড়ির পথ ধরে সামনের দিকে। ফসল তোলা হয়ে গেছে প্রায় ক্ষেতেই। ধান ঝাড়াইয়ের শেষে খড়গুলো ওরা তুলে রেখেছে গাছে-গাছে। আমাদের মত গাদা দেবার জায়গার অভাব ওদের, তাই গাছের কাণ্ডে আর ডালে খড়গুলি ওরা জড়িয়ে রেখে দেয়।

ডিম্ ডিম্ ডিম—

কাছে পিঠে কোথাও ঢাকের আওয়াজ উঠছে বলে মনে হল। এগিয়ে গেলাম আওয়াজটা লক্ষ্য করে। খানিক পথ হেঁটে একটা পাহাড়ের ধারে এসে পৌঁছলাম। গাছের আড়াল সরে যেতেই দেখলাম, প্রায় সমতল জলাভূমির ওপর দাঁড়িয়ে একটি পাহাড়ী অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ঢাকটিতে কাঠি পিটছে, আর কয়েকটি মেয়ে মাথা নুইয়ে তালে-তালে ফসল কাটছে, গুনগুনিয়ে গান গাইছে।

আমার দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেল বাদ্যিকার। মেয়েগুলি একবার চোখ তুলেই আবার পূর্বাবস্থায় স্থির হয়ে রইল। বাদ্যি থেমে গেছে ততক্ষণে। আমরা এগিয়ে গেলাম বাদ্যিকারের সামনে। ওদের ক্ষেত-খামার আর জমিজায়গা বিলি-ব্যবস্থার খবরদারি চলল কিছুক্ষণ। বাদ্যিকার হল থাতোয়ানের লোক, অর্থাৎ ক্ষেতমালিকের কর্মচারী। মেয়েগুলি মজুরনী। ওদের কাজকর্ম তদারকের জন্যই রয়েছে সে, আর কাজে উৎসাহ দিচ্ছে ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে।

ইংরাজ আমলের পূর্বে যখন গুর্খাদের শাসন চলেছিল কুমায়ুনে তখন থেকেই এই থাতোয়ান-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। তারও আগে গ্রামের লোকেরা বিস্তীর্ণ পাহাড়ে পাহাড়ে নিজেদের প্রয়োজনমত ক্ষেত তৈরি করে চাষ-আবাদ করেছে। পুরুষানুক্রমে ভোগ করেছে সেই জমি। কিন্তু গুর্খারা এসেই সৃষ্টি করল এই অনাকাঙ্ক্ষিত থাতোয়ান-সম্প্রদায়। যারা গুর্খা শাসনে নানাভাবে সাহায্য করত শাসকদের, তাদের এক-একটি এলাকার থাতোয়ান করে দেয়া হত। সাধারণ পাহাড়ীরা ঐ সময় থেকে থাতোয়ানদের অধীনেই জমি চাষ করতে লাগল। তারা থাতোয়ানদের কর দিত, ধমক খেত আর তামিল করত তাদের হুকুম।

কুমায়ুন অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা বড় বেশি দরিদ্র। পাথরের দেয়াল-ঘেরা খড়ের অথবা কাঠের ছাউনি-দেয়া ছোট-ছোট ঘরে ওরা বাস করে একসাথে পাঁচ-সাত জন। পোষাক-পরিচ্ছদের

অবস্থা করুণ। সরকারী রিজার্ভ ফরেস্টের থেকে আগোচরে অনেক সময় ওরা কাঠ সংগ্রহ করে আনে। ঐ কাঠের আগুনে শীত নিবারণ আর রুটি সেঁকা দু কাজই চলে। খাদ্য ওদের রুটি, সঙ্গে আলু-পোড়া আর কাঁচালঙ্কা—ব্যস। চা, বোধকরি এই একটি-মাত্র পানীয়, যার কদর পৃথিবীর সর্বত্র—কি গ্রীষ্ম কি শীতপ্রধান দেশ। এখানেও আবাল-বৃদ্ধ-রমণী, চলতি পথের ধারে, ক্ষেত-খামারে মগ বা গেলাসে চা খাচ্ছে চুক্-চুক্ করে। ধন্য এই চা-মাহাত্ম্য। মহাচীনে যার প্রথম স্বীকৃতি, পরে-পরে শক্তিদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের মত নানা চক্রান্তের মাঝ দিয়ে যার বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা।

পাহাড়ীদের কেউ-কেউ রেল স্টেশনে বা বাস-স্ট্যাণ্ডের আশে-পাশে কুলিকামিনের কাজ করে দু পয়সা কামায়। চোরাই লকড়িও বেচে দু পয়সা রোজগার করে। অনেকে ঘরে ছাগল, ভেড়া আর গরু পোষে। পাহাড়ী ছেলে-মেয়েদের পাহাড় থেকে পাহাড়ে কখনো কখনো গরু ছাগল চরিয়ে ফিরতে দেখা যায়।

হর্নের আওয়াজে চমকে পেছু ফিরলাম। আমাদের শৈলরথ এসে গেছে। রথারোহণ করলাম। আমাদের নিয়ে আঁকাবাঁকা পথে আবার ছুটে চলল গাড়ি।

শিউপ্রসাদ এবার আমার হাত ধরে ফেলল, তুমারে বাবুজী হামার বাড়ি লিয়ে যাবে।

হেসে বললাম, তোমার দেশেই তো ঘুরছি শিউপ্রসাদ।

সে হবে না। হামার বাড়ি তুমি যাবে। দুধ গোস্ত সব খাওয়াবে; হাত ধরে টানতে লাগল শিউপ্রসাদ; যেন এখুনি গাড়ি থামলেই সে আমাদের তার বাড়ির দাওয়ায় এনে তোলে। ও দিকে মুন্নি বসে-বসে দাদার কাণ্ড দেখছিল; এতক্ষণে সেও ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে দ্বিগুণ উৎসাহে আমার আর-একটা হাত ধরে টানাটানি জুড়ে দিল। মহা ফ্যাসাদ! সরল পাহাড়ী মন কিন্তু একেবারে গোঁয়ার-গোবিন্দ। একবার মগজে যা ঢুকেছে

তাকে সহজে নামানো বড় দায়। তাই আপাতত কি করব ভাবছি, হঠাৎ চলতি গাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়াল। সবাই ঝাঁকুনি খেয়ে খানিক তফাত হয়ে গেলাম। পথের ধারে মেয়ে পুরুষ বাচ্চা কাচ্চায় মিলে এক একটি ছোট-ছোট দল ইতস্তত ছড়িয়ে বসেছিল। তাদেরই একজন হাত দেখিয়ে গাড়ি থামিয়েছে। লোকটি এবার ড্রাইভারের কাছে এসে তার হাতে একটি চিঠি দিয়ে কোথায় যেন পোঁছে দিতে বলল। চিঠি নিয়ে ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। শিউপ্রসাদকে বললাম, এরা সব কোথায় চলেছে রে, মেলায় নাকি?

না বাবুজী, উপর পাহাড়ে বহুৎ জাড়া পড়া হ্যায়, তাই সব নীচু চলা যাতা হ্যায়। ফিন গরমী পড়লে সব চল আয়েগা।

দু-তিনটি মাস ধরে শৈলশৃঙ্গে চলতে থাকে শীতের অভিযান। তখন,

—উত্তর বায়ে একতারা তার
তীব্র নিখাদে দিল ঝঙ্কার—

চীর গাছের মনোরম অরণ্যে উত্তুরে হাওয়ার রণসংগীত চলে তখন। পাহাড়ের গায়ে রিম্ ঝিম্ ঝরতে থাকে তুষারকণিকা—হিম ঋতুর বিজয়স্বাক্ষর। দলে-দলে পর্বতবাসীরা তখন পলাতক। কুমায়ুনের মানুষ-খেকো বাঘেরাও তখন মানুষের আশা ত্যাগ করে গহন অরণ্যানীর মধ্যে আত্মগোপন করতে থাকে। সেখানে তারা শৈত্য কাতর মৃগাদির অসতর্ক মুহূর্তগুলির জন্য ওৎ পেতে রয় আর সন্ধান বুঝে তাদের তাজা উষ্ণ রক্তে শীতসঙ্কুচিত দেহটাকে উত্তপ্ত রাখবার চেষ্টা করে। তারপর এক সময়,

—পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে
যেন কোন দুর্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে—

এমনি করে কখন শীতের অবগুণ্ঠন খসে পড়ে। পর্বতদেহে রিক্ত পত্র লতাগুল্মে আবার বাজতে থাকে প্রাণের সেতারের সুর। পাখিরা ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে আসে দেশ দেশান্তর থেকে। তাদের চঞ্চুচুম্বনে লতাদেহ রোমাঞ্চিত হয় আর গুচ্ছ-গুচ্ছ কামনার কুসুম ফোটাতে থাকে। এমনি করে কুমায়ুনের কানন কান্তারে চুপি-পদসঞ্চারে কখন আসে প্রথম বসন্ত তার খোঁজ বড় একটা কেউ রাখে না। তখন কেবল,

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

চলে মধুকর সারি, প্রিয়া পথ অনুসরি
একই কুসুমপাত্রে পানে নিমগন,
প্রিয়া অঙ্গে বারংবার শৃঙ্গ ঘষে কৃষ্ণসার
স্পর্শসুখাবেশে মৃগী মুদিত নয়ন।

A beautiful subject—প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন শিল্পী। কিন্তু গাড়ি তখন থার্ড গীয়ারে গর্জে চলেছে। ক্যামেরা বের করার অবকাশই মিলল না কোনোরকমে।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একখণ্ড সমতল ভূমি পেরিয়ে উঠে আসছিল শতাধিক পাহাড়ী রমণী। পরনে কালো ঘাগরা আর কামিজ। মাথায় সবুজ তৃণের বোঝা। পাহাড়ের আড়াল থেকে যেমন আকস্মিক তাদের আবির্ভাব তেমনি চকিত তাদের অন্তর্ধান।

ঘাসওয়ালী রমণী ওরা। গরু, ঘোড়া আর ছাগলের জন্যে ওদের নিত্য তৃণ সংগ্রহ করে ফিরতে হয় পাহাড় থেকে পাহাড়ে। চীর পাইনের অরণ্য এবার ঘন হয়ে আসছে, গাড়ি প্রবেশ করছে রাণীক্ষেত এলাকায়। কুমায়ুনের মধ্যমণি রাণীক্ষেত। সমুদ্র সমতল থেকে ছ হাজার ফিট ওপরে পরম রমণীয় শৈলাবাস। নৈনীতাল থেকে সাঁইত্রিশ মাইল পথ পেরিয়ে আসতে বাসের লাগলো পুরো তিন ঘণ্টা। স্ট্যাণ্ডে এসে বাস থামল। যথারীতি

কুলিরা ভীড় করে এগিয়ে এল। কয়েকজন উঠে পড়ল একেবারে বাসের ছাদে যাত্রীদের মালপত্র নামানোর জন্যে। বাসের ছাদ থেকে আওয়াজ এল, বাবুজী এ আপকো বেডিং?

দেখি শিউপ্রসাদ কখন্ বাসের ছাদে উঠে আমার বেডিং নামানোর ব্যবস্থায় লেগেছে। মালপত্র নামানো হল, এখন হোটেলে যাত্রা। নৈনীতালে থাকতে করুণাদি বলে দিয়েছিলেন, আরামে থাকতে চান তো নটন হোটেলে গিয়ে উঠবেন। কিন্তু শুনলাম, নটনে যেতে হলে আরও ওপরে উঠতে হবে। তাই কাছে-পিঠে কোনো একটি হোটেলে যাওয়াই স্থির করলাম। হিমালয় আর স্নো-ভিউ হোটেল দু পা এগিয়েই, আপাতত মাথা গোঁজা যাক ঐখানে।

শিল্পী বললেন, চলো যাই হিমালয়ে।

বললাম, প্রভাতে উঠে বাতায়নপথে তুষারের শোভা দেখতে হলে স্নো-ভিউ হোটেলই তো অপরিহার্য বলে মনে হচ্ছে।

শিল্পীর মন্তব্য শোনা গেল, হিমালয়ে গেলে আশা করি বরফ দেখার অসুবিধে হবে না। হিমের আলয়ে একবার পৌছলে শুধু বরফ দেখা নয়, চাইকি ছোঁয়াও যেতে পারে।

পরে বুঝেছিলাম শিল্পীর কথায় সায় না দিলে বিপদেই পড়তে হত। কারণ হোটেল স্নো-ভিউ থেকে হয়তো কোনো এক সময়ে হিমালয়ের অভিরাম তুষারমৌলী দেখা যেত, আর সেজন্যে হোটেলের মালিক এই লাগসই নামটি রেখেছিলেন ভ্রাম্যমাণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে; কিন্তু হোটেল হিমালয় যে দিন তার সামনে বাধার বিন্ধ্যাচল হয়ে ধীরে-ধীরে মাথা তুলল, সে দিন স্নো-ভিউ তার পূর্ব গৌরবটি হারিয়ে বসল। এখন স্নো-ভিউ হোটেলের বাসিন্দাদের কেউ যদি প্রভাতে স্নো দেখার আকুল আগ্রহে বাতায়নটি খোলেন তাহলে সামনে তাঁকে হিমালয়ের তুষারমৌলীর বদলে হিমালয় হোটেলের সবুজ-রঙ-করা কাঠের থামগুলিই দেখতে হবে।

হিমালয় হোটেলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে কুলিকে ডাক দিতে গিয়ে দেখি শিউপ্রসাদের মাথায় আমাদের বেডিং আর মুন্নিদেবী ধরে আছেন আমাদের সুটকেস। ব্যাপার কি!

আমাদের ফিরতে দেখেই শিউপ্রসাদ বলল, চলিয়ে বাবুজী, সাঁঝমে বাড়ী পৌঁছে যাবে।

সেকি? আমাদের যে এখুনি হোটেলে যেতে হবে।

শিউপ্রসাদ কানেই তুলল না কথাটা। সে এতক্ষণ স্থির নিশ্চয় হয়ে আছে যে আমরা তার দেশে অবশ্যই যাচ্ছি। শিউপ্রসাদ পায়ে-পায়ে চলতে শুরু করল দেখে শিল্পী হেসে তার হাত ধরে থামালেন। এদিকে মুন্নি আমার লং কোট ধরে টানাটানি আরম্ভ করেছে।

এদের কি করে বোঝাই যে আমরা শৌখিন ভ্রাম্যমাণ, গায়ে পাহাড়ী হাওয়া লাগানোর জন্যেই বেরিয়েছি। দুর্গম গিরিক্রোড়ে দীর্ঘ পায়ে-হাঁটা পথের ধারে যে অখ্যাত পাহাড়ী পল্লীটি, সেখানে যাবার শক্তি আমাদের নেই। শুধু মনে-মনে সেসব দুর্গম স্থানের স্বপ্ন দেখে আমরা আনন্দের প্রসাদ লাভ করি।

বর্তমান পরিস্থিতির থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে শিল্পী মিথ্যার আশ্রয় নিলেন, দেখ শিউপ্রসাদ, নৈনীতাল পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে খুব চোট লেগেছে। এখানে দু দিন জিরিয়ে নিয়ে তোমাদের দেশের দিকে রওনা দেব। একদিন হয়তো দেখবে আমরা তোমাদের বাড়ির দরজায় লটবহর কাঁধে হাজির হয়েছি। কথার গুরুত্ব বিশ্বাস করল সরল পাহাড়ী ছেলেটি। কিন্তু মুন্নি বাংলা বোঝে না, তাই শিউপ্রসাদকে নিবৃত্ত করলেও মুন্নিদেবীর উৎসাহ কমল না। সে বার-বার তার মাতৃভাষায় দাদাকে উৎসাহিত করতে লাগল; নিজে আমাদের সুটকেসটা তুলে নিল মাথায়। শেষে শিউপ্রসাদ যখন তাকে বুঝিয়ে দিলে যে সাহেববাবুরা দু-চার দিন বাদ তাদের বাড়িতে গিয়ে নিশ্চিত উঠবে তখন মুন্নিদেবীর উৎসাহে কিছুটা ভাঁটা পড়ল। সাহেববাবুদের তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাড়ির সবাইকে একেবারে অবাক করে দেবে, আপাতত সে

বাসনাটা পূর্ণ না হওয়ায় মুন্নিদেবী কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেন মনে হল। তবে অদূর ভবিষ্যতে তার সে আশা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা আছে জেনে হয়তো কিছুটা আশ্বস্তও হলেন। এবার দেখি আর-এক কাণ্ড। আমাদের বেডিং, সুটকেস আর হাতব্যাগ শিউপ্রসাদ আর মুন্নি নিয়ে চলল হিমালয় হোটেলে। ভাবলাম, নিয়ে যেতে চাইছে তো চলুক না, কিছু বকশিস দিলেই হবে। হিমালয় হোটেলে পৌঁছে থাকার একটা ব্যবস্থা করা হল। এবার শিউপ্রসাদ আর মুন্নিকে বিদায় দিতে হয়, কারণ ওরা এখনও পাহাড়ী পথে আট-দশ মাইল পাড়ি দেবে। শিল্পী তুটি টাকা বের করে দিতে গেলেন শিউপ্রসাদের হাতে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল ভাই-বোনে; টাকা দেখে দৌড়ে পালাল। আমরা এগিয়ে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে তারা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচের পথে নেমে গেছে। পথ থেকে শিউপ্রসাদের গলা শোনা গেল, বাবু জরুর যাবে হামার বাড়ি। মুন্নিও সুর মিলিয়ে দাদার কথার প্রতিধ্বনি তুলল।

* * *

বেলা পড়ে আসছে। তু শ মাইল বিস্তৃত তুষারমৌলীতে আবীর রঙের ছোপ লেগেছে। দূরের পাহাড়গুলি অস্পষ্ট হয়ে আসছে। আমরা বারান্দায় চেয়ার ফেলে দেখছি সেই ছবি। তার সঙ্গে মনের পর্দায় আর-একটি ছবি ভেসে উঠছে, তুটি পাহাড়ী ভাই-বোনে চলেছে উচ্চাবচ বন্ধুর পার্বত্যভূমি পার হয়ে। সন্ধ্যার পথ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কাঞ্চনফুলের মত সুন্দর মেয়েটির মুখখানি হয়তো ক্লান্তিতে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। দাদা আশ্বাস দিয়ে বলছে, ঐ দূরে আলো দেখা যায় মুন্নি—ঐতো আমাদের গাঁও রে।

সারা সন্ধ্যা সেই সরল তুটি শিশু প্রাণের উত্তপ্ত স্পর্শ অনুভব করতে লাগলাম।

রাণীক্ষেতে ভোর হয় হিমাচলের হিমবাতাসের ছোঁয়া লেগে। চোখ মেলে দিলেই দেখা যায় নগাধিরাজ হিমালয়ের শ্বেত

সিংহাসনটি পাতা রয়েছে। দু শ মাইল বিস্তীর্ণ হিমশৈলী, তপন করছে বিচিত্রবর্ণের আরতি। দূরে কাছে ধূমল নীল শৈলমালা। হিমালয়ের সংখ্যাতীত সামন্ত নৃপতি যেন। চীর গাছের পল্লবে-পল্লবে ভোরের বৈতালিক বন্দনা শুরু হয়ে যায়। প্রভাতের সেই পবিত্র মুহূর্তটি যে-কোনো ভ্রাম্যমাণের অন্তরে অক্ষয় হয়ে থাকে।

রাণীক্ষেতের সম্পদ তার বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, অপরূপ হিমশৈলের বিস্তার আর অগণিত চীর বৃক্ষের অরণ্য।

প্রাতরাশ শেষ করে বের হলাম রাণীক্ষেতের বাজারে। নাতিদীর্ঘ বাজার, কিন্তু হরিদ্বারের মত অপরিচ্ছন্ন নয়। শিল্পী এগিয়ে এলেন একটি দোকানের সামনে—মিষ্টির দোকান। কিছু চকোলেট-জাতীয় মিষ্টি কেনা হল। মুখে দিয়ে বুঝলাম দাঁতের সঙ্গে সহজে এর সদ্ভাব হবে না। কিন্তু কিছু সময় নিষ্পেষণের পর একেবারে অমৃতের স্বাদ পাওয়া গেল। শিল্পী বললেন, বুঝলে ভাই, যাকিছু উত্তম তাকে লাভ করতে হয় দুঃখের তপস্যায়।

কিছু পথ এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি ফুলন্ত বন্য চেরীর তলায় চার-পাঁচটি সুবেশা পাহাড়ী তরুণী বসে আছেন। তাঁদের মাথার ওপর বিরাটাকার এক উদ্যানছত্র শোভা পাচ্ছে। কলকাতার পথে ছত্রপতি মহেন্দ্র দত্তের—রোদে জলে সমান প্রয়োজনীয়—মার্কা-মারা যে বৃহদাকার ছত্র ঘুরতে দেখা যায় ঠিক তারই অনুরূপ বিচিত্র বর্ণের সিল্কে-তৈরি এই রমণীয় ছত্রটি। ছত্রাধিকারিণীদের কাছাকাছি হতেই শিল্পী ক্যামেরাটিতে অক্ষি সংযোগ করলেন; অমনি লীলাভরে হেসে পঞ্চ বান্ধবীতে ছবির ভেতর প্রাণ সঞ্চার করলেন।

আলাপ হল। উচ্চশিক্ষিতা সিকিমী পরিবারের কন্যারা পিকনিকে এসেছেন। এঁদেরই একজনের স্বামী বেরিলি-ব্রিগেডের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। রাণীক্ষেতে এসেছেন ভ্রমণ উপলক্ষে। রূপবতী শৈলভূমিতে রূপের হাট বসিয়েছেন। কমলা দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করলেন ওঁরা। প্রতিদানে আমরাও ওঁদের [illegible]-কেনা দন্তবিদারক সেই চকোলেট কিছু দিলাম। বড় খুশি।

বললেন, চৌবাটিয়া গিয়েছেন ?

বললাম, এইতো সবে যাত্রা শুরু। নীচের গাছপালা মানুষজনের সঙ্গে আলাপ চলেছে, এরপর ওপরের পালা। সৌভাগ্য, ওপরের মানুষদের সঙ্গে নীচেই আলাপ হল।

এমনি কিছু সময় আলাপচারীর পর উঠে এলাম সেখান থেকে। হাত তুলে পঞ্চকন্যা আমাদের বিদায় জানালেন।

ফিরতি পথে শিল্পী অনুচ্চে বললেন, প্রভাতেই পঞ্চকন্যার দর্শন পাওয়া গেল।

পাদপূরণ করে বললাম, দিন যাবে আজি ভাল।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে রণদামামা ধ্বনি শুনে থমকে দাঁড়ালাম। ওপরে উঠে দেখলাম বেশ বড় রকম এক পল্টন কুচকাওয়াজ করছে প্যারেড গ্রাউণ্ডে। এ যেন পদ্মবনে মত্ত হস্তীর দাপাদাপি। আসলে কিন্তু প্রারম্ভিক যুগে সৈন্যনিবাস রূপেই রাণীক্ষেতের পত্তন হয়েছিল। এখন রাণীক্ষেতের দুটি অংশ। নীচে বাজার, বাস-স্ট্যাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে মূল রাণীক্ষেত আর ওপরে হল চৌবাটিয়া ক্যানটনমেণ্ট। চৌবাটিয়া বেরিলি ব্রিগেডের গ্রীষ্মাবাস। এখানে পুরো তিনটি ব্যাটেলিয়ান সৈন্যের থাকবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। শৈলভূমির ওপর সচরাচর এ ধরনের সমতলক্ষেত্র মেলে না, তাই রাণীক্ষেতের এত বেশী কদর।

রাণীক্ষেতের যে-কোনো পথ দিয়ে গেলেই মনে হবে যেন শিল্পীর হাতে-আঁকা এক টুকরো ছবি। নেহেরু মার্গ, কিম্বা অনুরূপ কোন মার্গ দিয়ে যাবার সময় দেখা যাবে পথের পাশে দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট চীর গাছের সমারোহ। পথের ধারে-ধারে কোথাও রঙ-করা কাঠের পোস্টের সারি, তার থেকে ঝুলছে রঙিন ফুলের টব। সমস্ত রাণীক্ষেত অঞ্চলটি যেন অপরূপ সজ্জায় বিয়ের কন্যার মত সেজে আছে। রাণীক্ষেতের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাই বুঝি লর্ড মেয়ো এক সময় সিমলা থেকে ভাইসরয়ের গ্রীষ্মাবাস এখানে সরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

এক অপরাহ্ণে আমরা বাসে চেপে চললাম চৌবাটিয়ায়। নীচের বাজার থেকে পাঁচ মাইল পথ ওপরে উঠতে হল। মিলিটারী মার্চ চলছিল তখন। কিছু সময় দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম। কনসার্ট বাজছে। পাহাড় অরণ্য ডিঙিয়ে সে ধ্বনি ভেসে চলেছে হিমালয়ের দিকে। তালে-তালে পা ফেলে এগিয়ে আসছে সৈনিকের দল; দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। সংগীতের ধ্বনি তাদের রক্তে এনেছে উন্মাদনা। ঐ তো সহস্র হাতে বন্দুক তুলে ধরল গগন নিশানা করে। সূর্যালোকে ঝক-ঝক জ্বলে উঠল সঙ্গীন। তাদের অন্তরের সঙ্কল্প কনসার্টের দীপ্ত সুরে ছড়িয়ে পড়ছে,—আসমুদ্রহিমাচল, আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমিকে রক্ষা করব আমরা, রক্ষা করব তার নদনদী-গিরিকান্তার-প্রাঙ্গণ-প্রান্তর মঠ-মন্দির, রক্ষা করব তার কোটি-কোটি শান্তিকামী সন্তানদের।

আরও খানিক ওপরে উঠে গেলাম। একটি ঘর, চারদিক ঘিরে তার পুষ্পোদ্যান। নানা রঙের আর ঢঙের ফুলে-ফুলে বসন্তোৎসব। মিলিটারী রেস্ট-হাউস বলে মনে হল। সামনে এগিয়ে দেখি অনতি-উচ্চ একটি পাঁচিল। পাঁচিলের ওপরে কতকগুলি তীর চিহ্ন আঁকা। ঐ তীরের গায়ে বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট শৈলশৃঙ্গ-গুলির নাম উৎকীর্ণ করা আছে। তীরের শেষপ্রান্তে চোখ রেখে দেখলেই সুদূর হিমগিরির শৃঙ্গগুলিকে সঠিকভাবে চেনা যায়। প্রথমেই নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের পরেই উপত্যকার মধ্যে বদ্রীনাথের মন্দির। তারপর একে-একে কমেট, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, পঞ্চচুলি। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নন্দাদেবী ( ২৫৬৬০ ফি. ), ত্রিকোণ তাঁবুর আকারে জেগে আছে। বামে ত্রিশূল পর্বত দেখা যাচ্ছে। শিল্পী তাঁর নোটবুকে পর-পর শৃঙ্গগুলির নাম ও অবস্থান লিখে নিলেন। পরে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এরপর সবাই মিলে ভালুক ড্যাম দেখতে গেলাম। সমস্ত রাণীক্ষেত সহরের জল সরবরাহ হয় এখান থেকে। ড্যাম দেখে অরণ্য পথ ধরে আবার উঠে আসতে লাগলাম চৌবাটিয়ায়।

দু ধারে অরণ্য ঘনগহন। অদৃশ্যচারী শেরের শঙ্কায় গা ছম-ছম করে ওঠে। ঠক্-ঠক্-ঠক্—একটা শব্দ ভেসে এল বনের ভেতর থেকে। আমরা থমকে দাঁড়ালাম। এ দিক ও দিক সভয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল একটি পাহাড়ী যুবক। অদূরে একটি চীর গাছের কাণ্ডে সে কুঠারের ঘা দিচ্ছিল। আমরা তার কাছে এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে সে হাতের কুঠারটি ফেলে একটি মাটির গেলাস ঐ গাছের কাণ্ডে ঝুলিয়ে দিয়েছে। চীর পাইনের ঐ রস সংগ্রহ করে নেওয়াই ওর কাজ। ওর থেকে তৈরি হবে তার্পিন তেল। লোকটি সরকারী বনবিভাগের বেতনভুক কর্মচারী।

যথাস্থানে এবার ফিরে এলাম। নীচে নামবার সংকেত জানিয়ে বার-বার গাড়িতে হর্ন দিচ্ছিল ড্রাইভার।

আমরা উঠে বসলাম। গাড়ি নীচের পথে গড়িয়ে যেতে লাগল। কিছুদূর এমনি আঁকাবাঁকা পথে নেমে এসে গাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়াল। দক্ষিণে সরকারী ফলের বাগান। এখানে ফল সম্বন্ধে রিসার্চ চালানো হয়। গাড়ি থেকে নেমে ফলের বাগানে ঢুকলাম। গাছে-গাছে আপেলের অজস্রতা। ফল-সংগ্রহকারীরা ফল সংগ্রহ করছে। ফল আহরণ করে কেউবা জড় করছে খড়ে-ছাওয়া ছোট একটি চালার ভেতর। ওখান থেকে ফল বাছাই হয়ে ঝুড়িতে করে চালান যাবে বিভিন্ন অঞ্চলে। ফিরে এসে দেখি অভাজনদের ফেলে গাড়ি কখন নীচে নেমে গেছে। ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কাননছায়ায় বসে পড়লাম। শৈশবের বন-বাদাড়চারী জীবনটার কথা মনে পড়ল। অগোচরে আম জাম কাঁঠাল আত্মসাৎ করার ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠল বার-বার। সামনের আপেল গাছটি ফলভারে ভেঙে পড়েছে, নেব নাকি কয়েকটা পকেটে পুরে। দূর ছাই, দেখি মনের সঙ্গে হাত অসহযোগিতা করে বসে আছে। বাল্যের সেই চুরি করার আনন্দ উত্তেজনাটুকু কোন ফাঁকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।

—ভাবিলাম হায় আর কি কখনো ফিরে পাবো সে জীবন!

গাড়ি এল আধঘণ্টা পরে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। আমরা নামছি এদিকে সন্ধ্যাও নামছে। মাঝে-মাঝে বনের অন্তরাল সরে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে তুহীনশীর্ষ হিমাচল। সোনার আঁচল-খসা সন্ধ্যা হাতে দীপশিখা নিয়ে নগাধিরাজের আরতি করে চলেছে। রক্তচেলী অঙ্গে জড়িয়ে হিমমন্দিরে নৃত্য করছে সহস্র সোমকন্যা। সন্ধ্যার মুখে গাড়ি আমাদের নীচের বাস-স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দিলে।

রাণীক্ষেতে এসে দীর্ঘ দু শ মাইল হিমাচলের তুষারমৌলী দেখা যায়, কিন্তু মনে হয় রাণীক্ষেতের সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে তার সীমাহীন সুন্দর চীর বৃক্ষের অরণ্যে-অরণ্যে। যে-কোনো একটি পথ ধরে আপন মনে গান গাইতে গাইতে হারিয়ে যান, কিছুক্ষণ চলার পর মনে হবে যেন কোন স্বপ্নরাজ্য পেরিয়ে চলেছেন। কোথাও বুনো চেরী তার ফুলে-ভরা অনুরাগের হাতছানি দিয়ে ডাক দেবে আপনাকে। কাছে গেলেই কাকলীর ধ্বনি তুলে ফুলের ফাঁকে-ফাঁকে অপরূপ পাখিগুলি আপনাকে জানাবে অভিনন্দন। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে যান, হয়তো শুনতে পাবেন কোথাও তৃণসংগ্রহকারিণী কোনো শৈলকন্যার কণ্ঠের ললিত সুরলহরী। সেই সুর লক্ষ্য করে এগিয়ে যান, চোখে-চোখ পড়লেই লজ্জায় থেমে যাবে শৈলকন্যাটি। আপনি সেই মুহূর্তটিকে অক্ষয় করবার জন্যে ক্যামেরা উদ্যত করেও থেমে যাবেন। পাহাড়ের আড়াল থেকে ভেসে আসবে আর-একটি কুমারকণ্ঠ। সম্ভবত একপক্ষ নীরব হয়ে যাওয়ায় অন্য পক্ষের গানে-গানে অনুসন্ধান। এরপর হয়তো গরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাবেন, আর কিছু পরেই দেখতে পাবেন একটি পাহাড়ী রাখাল-প্রেমিক আপনার সামনে এসে অবাক চোখে তাকাচ্ছে।

কুমায়ুনের শৈলে-শৈলে প্রেমের প্রজাপতি এমনিভাবে সুরের পাখায় ভর করে উপলমুখর কোশী নদীর বাঁকে-বাঁকে অথবা বন্যচেরী আর চীর পাইনের কাননে-কাননে চঞ্চল নৃত্যে ঘুরে বেড়ায়।

যদিও শ্রান্তি আসবে না পথ চলায় তবুও যদি বিশ্রামের প্রয়োজন হয় তাহলে কিছু সময় এসে বসতে পারেন সরল ঋজু চীর অরণ্যের নীচে কোন শিলাসনে। দূর তুষার শৈলের হিমেল হাওয়া বইবে চীর গাছের ঝিরি ঝিরি চিক্কণ পাতার ফাঁক দিয়ে। অমনি গান শুনতে পাবেন—পল্লব-সংগীত। দূরে কাছে সর্বত্র শৈলসংলগ্ন চীর পাইনের অরণ্যে-অরণ্যে সে সংগীত বেজে চলবে। অস্পষ্ট কোনো জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে মনে হবে—হিমাচলের অলকা-পুরী থেকে কল্পকন্যারা রূপবতী রাণীক্ষেতে নেমে এসে তাদের সুরসভা বসিয়েছে। কন্যাদের চম্পক করাঙ্গুলির চালনে সেতারের মিষ্টি মিহি সুরের ঢেউ বাতাসের বুকে ভর করে শৈলে-শৈলে ভেসে চলেছে।

## ॥ আনন্দতীর্থ আলমোড়া ॥

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড় পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কী জানি কী বাণীর-সন্ধানে।

রাণীক্ষেত থেকে আলমোড়ার দূরত্ব তিরিশ মাইল। পাহাড়ী সরীসৃপের মত ছড়ানো পথের ওপর দিয়ে, উপত্যকা আর সু-উচ্চ শৈলমালা পেরিয়ে আমাদের বাস চলল আলমোড়া অভিমুখে। পেছনে পড়ে রইল রূপবতী রাণীক্ষেত। গাড়ি এক সময় আলমোড়া স্ট্যাণ্ডে এসে থামল। কিছু দূরের থেকেই গাড়ির পেছন-পেছন একটি অদ্ভুত গুঞ্জন ধ্বনি শুনে পাশে তাকিয়ে দেখি, বেশ কয়েকটি কুলি—হোল্ডল-হোল্ডল, বেডিং-বেডিং, সুটকেস-সুটকেস শব্দ করতে করতে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে আসছে। বুঝলাম বাসের ওপর রাখা দ্রব্যগুলির কোন্‌টি কার অধিকারে যাবে তারই আগাম বোঝাপড়া চলছিল নিজেদের ভেতর। বাস স্ট্যাণ্ডে নেমেই হোটেলের সন্ধান করলাম। দু-একটি হোটেল ঘুরে দেখলাম, অবস্থা ও ব্যবস্থা কোনো দিক থেকেই সুবিধের নয়। অবশেষে এক ভদ্রলোক দেওদার হোটেলের নাম করলেন। সেখানে খানাপিনা আর দক্ষিণা সবই নাকি বহুৎ আচ্ছা। যেমন করেই হোক একটা ভালো আস্তানা তখন আমাদের কাম্য। তাই কুলিদের নিয়ে ঐ হোটেলে গিয়েই উঠলাম।

দেওদার বনের মাঝে হোটেলটি, তাই নামটিও তার দেওদার হোটেল। সাজসজ্জা একদম সাহেবী। ভ্রাম্যমাণের তালিকাতেও

দেখলাম দু বছরের ভেতর আমাদের নিয়ে সর্বমোট চার জন বাঙ এর পাতায় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আর বাকী সবই বিদেশবাসী। পরিবেশটি প্রশান্ত আর নিরিবিল দেখে শিল্পী এই স্থানটিই নির্বাচন করলেন। খানসামা নূর মহম্মদ সামনে এসে সেলাম দিয়ে জানালে—হুজুরদের কি আদেশ।

দীর্ঘ সুগঠিত চেহারা। প্রৌঢ়ত্ব শেষ প্রান্তে এসে যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

শিল্পী বললেন, গরম পানি আগে ভেজাও তারপর খানার ব্যাপারটা জেনে নাও ও-বাবুর কাছ থেকে।

কিছু খাবার ফরমায়েশ করলাম। নূর মহম্মদ দ্বিতীয় বার সেলাম দিয়ে চলে গেল।

এ যাত্রায় ভাঁড়ারের ভার ছিল আমার ওপর আর আস্তানা নির্বাচনের ভার ছিল শিল্পীর। খাদ্যবস্তুর ওপর কখনো সখনো আমার জিহ্বার অতিরিক্ত মমত্ববোধ শিল্পীকে চঞ্চল করে তুলত, কারণ শিল্পী ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পাহারী।

এই ভোজন ব্যাপারে কথা উঠলে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নানা কথার অবতারণা করতে হত। গুপ্ত কবির কবিতা থেকে ভোজ্য বস্তুর মহিমা বর্ণনা করে শোনাতাম। কিন্তু ভোজনে নির্বিকার যে মানুষ তার কাছে ছত্রিশ ব্যঞ্জনের গুণকীর্তন করার অর্থই হল শূন্য গৃহে বক্তৃতা দেবার সামিল। তবে এ-হেন মানুষও নূর মহম্মদের রান্নায় দুর্বল হয়ে পড়লেন। একেই বলে খাঁটি দ্রব্যগুণ।

সারাটা দিন মেঘৈর্মেদুরম্বরম্—বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। তবে অম্বর মেঘে আচ্ছন্ন হলেও মেঘ ছিল পাতলা কুয়াশার চাদরের মত আর বনভূমি তমালের পরিবর্তে দেবদারুদ্রুমেই ঘনশ্যাম হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতই মন খারাপ—বহির্যাত্রার দফা নিকেশ; তবে বারে বারে যাযাবর মন উড়ু-উড়ু। শিল্পী দিব্যি প্রশস্ত দাওয়ার প্রান্তে বসে আছেন একটি কেদারায়, আপাদমস্তক একটি ভুটিয়া কম্বলে আবৃত। যস্মিন দেশে যদাচার।

গান এসেছে গলায়,—

আমি চঞ্চল হে—
আমি সুদূরের পিয়াসী।

সাধা গলায় গান নয়; প্রাণের তাগিদে গলা ঠেলে সবার যেমন গান বেরুতে চায় এ ঠিক তাই। একই লাইন বার-বার ফিরে-ফিরে আসতে চায়। সুরে যখন পায় তখন কথার নির্বাসন। দু-চারটি কথার টুকরো তখন সুরের পাখায় ভর করে ভাবের ইন্দ্রজাল বুনে বুনে চলে।

বাইরে থেকে শিল্পীর মন্তব্য শোনা গেল, সুদূরের জন্যে চঞ্চল হও ক্ষতি নেই তবে এই মেঘলা দিনে কবিগুরুর বারণটা স্মরণ করে ঘরের বাইরে আর বেরিও না যেন। নিতান্ত যদি ঘরে মন না বসে তবে তাকে মেঘের সঙ্গী করে দাও, তাহলে ঘরে বসেই দিগ্-দিগন্তের পারে ঘুরে আসতে পারবে। এবার নিজেই গান ধরলেন শিল্পী, 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'। সেই সুরের টানে ঘরের ভেতর আর-একটি কণ্ঠও যুক্ত হল। শিল্পী তাঁর সংগীতকে ঘরের ভেতর পাঠাবার চেষ্টা করছেন এবং গৃহবাসী যথাশক্তি গলার কসরতটুকু বাইরে শিল্পীর কানে পৌঁছে দেবার জন্য আপ্রাণ সাধনা করে চলেছে। এমনি করে সংগীতের আসর জমে উঠল। তখন উভয়ের জানা-অজানা, আধ-ভাঙা, সিকি-ভাঙা, রামপ্রসাদী থেকে রবীন্দ্রগীতি, সিনেমা সংগীত থেকে মলয়ার বারমাস্যা পর্যন্ত কোন কিছুই বাদ রইল না। এ যেন,

—দুই পালোয়ান কুস্তি করে
হার কেহ না মানে—

এমনি কতক্ষণ ধরে চলল সুরাসুরের যুদ্ধ। সহসা গান ভঙ্গ হল। বাইরে শিল্পীর গলায় গান থেমে গেছে। তৃতীয় কোন প্রাণীর অতি উচ্ছল এক হাসির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বেরিয়ে এসে দেখি হোটেলের শেষপ্রান্তে এক-বোঝা ঘাসের আঁটি মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে এক পাহাড়ী তরুণী, সারা মুখটা তার হাসিতে

ঝলমল করছে। ইতিমধ্যে মেঘাবরণ সরে গিয়ে দিনান্তের রাঙা রদ্দুরটুকু দেওদার আর চীর গাছের পল্লব বেয়ে ঝির-ঝির করে সারা উঠোনে ঝরে-ঝরে পড়ে যাচ্ছে।

শিল্পী দৌড়ে ভেতর থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে এলেন।

নাম কি তোমার?

আবার সেই হাসি। নূর মহম্মদ কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটির হয়ে নূর মহম্মদই জবাব দিলে, হজৌর, হিরুলী দেবী ওর নাম।

হাস্যময়ী হিরুলী দেবীর কয়েকটি ছবি তুললেন শিল্পী। নূর মহম্মদের কথা থেকে জানা গেল হিরুলী দেবী হোটেলের আশ-পাশ থেকে রোজ তার গরুর জন্য ঘাস কাটতে আসে; তাছাড়া মেয়েটির গানের গলা খুব শরিফ।

পাহাড়ী গান শোনার খেয়াল চেপে বসল মাথায়। বললাম, গান শোনাবে হিরুলী দেবী?

এবার একা-একা কেমন লজ্জায় পেল তরুণী পর্বত-কন্যাটিকে। অমনি জোরে চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করে দিলে, সাথীওলী—সাথী-ও-লী। ওর ঘাস কাটার সঙ্গিনী সম্ভবত। একটু পরেই এক বোঝা ঘাসের আঁটি মাথায় নিয়ে সাথীওলীর আবির্ভাব।

এবার দু জনে মিলে হোটেলের দাওয়ায় উঠে বসল।

নূর মহম্মদের দিকে তাকিয়ে জটিল পাহাড়ী ভাষায় তারা সারাদিনের খুশির জমাখরচ দিতে লাগল। দু-চারটি কথায় বোঝা গেল বৃদ্ধ নূর মহম্মদের সঙ্গে এদের বিশেষ জানাশোনা আর সম্প্রীতি আছে। শেষে নূর মহম্মদই হিরুলী দেবীকে একটি গান গাইতে বললে।

সন্ধ্যা নেমেছে—সঙ্গে-সঙ্গে শীতের কামড় শুরু হয়েছে। বাইরে আর বসা চলে না। ওদের সবাইকে ভেতরে আসতে বললাম। আলো জ্বেলে দিলে নূর মহম্মদ। ঘরের এক কোণে বসল দুই সখী,—হিরুলী আর মতিমা দেবী;

আবার একপ্রস্থ গান গাইবার অনুরোধ জানান হল। এবার দুই সখীতে মুখোমুখি হয়ে ইঙ্গিতে একটু পরিহাস বিনিময় করলে। তারপর হিরুলী দেবীর গলায় সুর এল। বিশেষ ধরনের পাহাড়ী টিউন। প্রথমেই সুরের একটা মিষ্টি টান,—শেষ দিকে গলাটা ভেঙে-ভেঙে কেঁপে-কেঁপে গেল। যেন জোয়ারের ঢেউ সিধে কিছু পথ এগিয়ে এসে ভাঙা-ভাঙা তরঙ্গ তুলে তটে আছড়ে পড়ছে। এবার বেলাভূমিতে জেগে উঠল কথার কলধ্বনি—

তুম জঙ্গল হুনি ঘা কাট হুনি জানসা
এক গটল ঘাস মেরা গরহুঁ লায়া
ঘাস মেরিঅঁ হুঁন চৈঁস
অর জলদি চৈঁস
( গাইতে গাইতে চোখের ইসারা )
কালেক্‌কি হামারা পাশ ঘাস নায়ি
গরু ভুখা মরনি।

ঘাসওয়ালী বনে চলেছে তার পোষা গরুগুলির জন্য ঘাস আনতে—পথে প্রেমিকের সাথে দেখা। প্রেমিক তার সঙ্গ চায়, কিন্তু মুখ ফুটে সোজা সে কথাটি সে বলে ফেলতে পারছে না, হয়তো অন্য জন রয়েছে সঙ্গে। তাই গানের ইসারায় প্রাণের কথাটি জানিয়ে দিয়ে বলছে,—ওগো মেয়ে, তুমি বনে চলেছ ঘাস কাটতে, আমার গরুর জন্যে একগুচ্ছ ঘাস নিয়ে এস। গোহালে আমার ঘাসের অনটন, গরুগুলি খিদের জ্বালায় অস্থির। কিছু তাজা সবুজ ঘাস এনো,—আর জলদি জলদি এসো কিন্তু।

গানের মাঝে-মাঝে অপূর্ব ভঙ্গি; চোখ ইসারায় দরদিয়া বঁধুর আহ্বানের অভিনয়।

গানের কথাগুলি যেখানে আসছিল, সেখানে শুধু আবৃত্তি করে বলে যাচ্ছিল গায়িকা। যেন কোনো রকমে কথার দেনা চুকিয়ে নিয়ে সুরের নাও বাইতে হবে। গানের সবটুকুই একটি মাত্র মিষ্টি সুরের

দোলায় দোল খাচ্ছে। তাতে একঘেয়েমী নেই, আছে একটানা এক সুরের মাদকতা।

গানের নৌকো পারে এসে পৌঁছল অমনি কূলে জাগল জলের ছলকানি। কলহাসিতে এবার ভরে উঠল আমাদের আসর। হাসি থামলে উঠে পড়ল দুই সখীতে। নূর মহম্মদ ইতিমধ্যে সান্ধ্য চা টেবিলে পরিবেশন করে গেছে।

বললাম, চা খেয়ে যাও।

আবার হেসে উঠল ওরা। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। নূর মহম্মদ জানালে, ওরা এখানকার চা খায় না হুজুর।

আমরা ভুলেই গিয়াছিলাম নূর মহম্মদ মুসলমান, আর আচার-বিচারে পাহাড়ীরা বড় বেশি রক্ষণশিল।

পরের দিন উঠেই প্রাতরাশ সেরে বের হলাম আটাম ফেসটিভ্যাল (শারদোৎসব) দেখতে। কয়েক মিনিট পদচারণ করে আমরা এসে পৌঁছলাম প্রদর্শনীক্ষেত্রে। কেদারনাথের মন্দিরের অনুকরণে প্রদর্শনীর তোরণদ্বারটি নির্মাণ করা হয়েছে বলে মনে হল। যথারীতি দু আনা দক্ষিণায় এক একটি টিকিট কিনে প্রদর্শনীতে প্রবেশ করলাম।

নৈনীতালে থাকতেই এই আটাম উৎসবের ছাপানো পোস্টার দেখেছিলাম মল রোডের দোকানগুলিতে। তাই মনে মনে এই উৎসব সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্য ছিল। ভেতরে ঢুকেই কিন্তু নিরাশ হতে হল।

পাঁচ-সাতটি ছোট ছোট স্টলে কয়েক প্রকার দ্রব্য সাজানো হয়েছে। কোনোটিতে কয়েকখানি গরম চাদর, কোনো স্টলে তামার তৈরি কলস, কোনোটিতে বা উত্তর প্রদেশ সরকারের কাঠের তৈরি দু-চার রকম জিনিষের নমুনা। গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য ও দু-চার রকম সব্জী রাখা হয়েছে অন্য একটি স্টলে।

অবশ্য উল্লেখযোগ্য না হলেও এইসব পার্বত্য ভূমিতে এ ধরনের প্রচেষ্টার একটা মূল্য আছে। আঞ্চলিক দ্রব্য—তা যত অকিঞ্চিৎকর

হোক না কেন, তাকে নিয়ে উৎপাদকের বিশেষ একটা আত্মতৃপ্তি আছে। তার প্রদর্শনের ভেতর দিয়ে একের সাধনা ও তৃপ্তি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বাইরে এসে ডান দিকে একটি কলেজ হলে ঢুকলাম। সেখানে চিত্রশিল্পের ও ফটোগ্রাফির একটি প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। কয়েকটি জলরঙে-আঁকা ছবি নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাবার যোগ্য। শিল্পী মন খুলে সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন।

বেরিয়ে এলাম প্রদর্শনীর বাইরে। দেখি সামনেই জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

বললাম, গরম গরম জিলিপি খাবেন নাকি ?

খাবো মানে ? শিল্পী যেন আকাশ থেকে পড়লেন—জানো এটি হল সর্বভারতীয় মিষ্টান্ন। এই জিলিপির প্যাঁচেই সকল ভারতীয় উদরগুলি বাঁধা রয়েছে। চলে যাও পূব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, সর্বত্র এর সমান সমাদর।

আমার রসনা পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত হয়ে ছিল, তার ওপর শিল্পীর এ ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য শুনে কালবিলম্ব না করে বেশ কিছু জিলিপি কিনে ফেললাম। এবার একটি উঁচু টিলার ওপরে বসে আমাদের ভোজন শুরু হল। সেদিন শিল্পী ( শিল্পীর স্বল্পাহারের ওপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে ) তাঁর অংশীদারের চেয়ে কয়েকখানা বেশি খেয়ে ফেলেছিলেন। সম্ভবত শিল্পী জিলিপিগুলির ভেতর একটা সর্বভারতীয় স্বাদ পেয়ে গিয়ে থাকবেন।

মিষ্টি খেতে খেতে একটি মিষ্টি সুর কানের ভেতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করতেই চমকে উঠলাম। এ সুর যে বিশেষ পরিচিত! শিল্পী বললেন, এ সুর উদয়শঙ্করের রামলীলাতেই শুনেছি কেবল, এখানে হঠাৎ এ সুরের আমদানি হল কোথা থেকে !

সচকিত হয়ে সুরের সন্ধান করতেই চোখ গিয়ে পড়ল পাহাড়ের নীচের ধাপের খানিকটা সমতল ভূমির ওপর। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি স্টেজ বাঁধা হয়েছে, ঠিক যেমনটি রামলীলা

ছায়ানৃত্যে হয়ে থাকে। ঐ স্টেজের ভেতর থেকেই গানের সুর ভেসে আসছিল। আমাদের পাশ দিয়ে একটি পাহাড়ী ছেলে উঠে যাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, রাতে রামলীলা ছায়ানৃত্যের অনুষ্ঠান হবে এখানে। তারই রিহার্সেল চলেছে সকাল থেকে।

মনে পড়ল বহু দিন আগে আলমোড়াতে উদয়শঙ্কর একটি কলাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বছর দুয়েক আগে নানা কারণে সেই সাধনপীঠ ছেড়ে আসতে হয়েছে তাঁকে। সম্ভবত সেই শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা আজও এই শৈলভূমিতে শঙ্করের সাধনাকে রূপ দিয়ে যাচ্ছেন।

জিলিপির দোকানীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, শুধু তারই নয়, এ অঞ্চলের প্রায় সব লোকেরই শঙ্করের ওপর এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে।

যন্ত্রসভ্যতার কোলাহল-মুক্ত প্রকৃতির এই লীলা-নিকেতনে বিশ্বের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পসাধক তাঁর সাধনার আসনটি পেতেছিলেন—এই চিন্তাও মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দের রোমাঞ্চ এনে দিল।

এখানে তুষারমৌলীর ভঙ্গিমায়, তরুলতার আন্দোলনে, ঝর্ণার ছন্দে নটরাজের যে নৃত্যলীলা অভিব্যক্ত হচ্ছে নিরন্তর,—সেই নৃত্যকে প্রত্যক্ষভাবে দেখবেন, এই ছিল সম্ভবত সাধক শঙ্করের মনস্কামনা। তাই সভ্যতার সমস্ত দানকে উপেক্ষা করেও তিনি এই দূর শৈলভূমিতে চলে আসতে পেরেছিলেন।

ফেরার পথে নন্দাদেবী মন্দিরটি দেখে এলাম। কোন এক চাঁদরাজা নাকি গাড়োয়াল আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এক সময় তুষারমৌলী নন্দাদেবীর কাছে শক্তি ভিক্ষা করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হলে তিনি নন্দাদেবীর নামে এই মন্দিরটি উৎসর্গ করেন। সেই থেকে এই প্রাচীন মন্দিরটি নন্দাদেবীর মন্দির নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছে। নৈনীতালের নন্দাদেবী

মন্দিরটি এই মন্দিরেরই অনুকরণে কোন এক বিত্তবান পরবর্তী কালে তৈরি করে দিয়েছেন বলে শোনা যায়।

ফিরে এলাম হোটেলে। স্নানের পাট প্রায় তুলে দিয়েছি। হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। খানসামাকে তলব দিলাম ; খানা তৈরি নূর মহম্মদ ?

রসিক লোক আমাদের খানসামা। বললে, :হজৌর, মোর্গা চিল্লাতা হ্যায় !

বিরাট ডাইনিং-রুমে গিয়ে বঙ্গবীরেরা নূর মহম্মদের রান্নার সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেলাম।

শিল্পী বললেন, শুধু নূর মহম্মদের রান্না মুর্গীর মাংস খাবার জন্যে বাংলাদেশ থেকে এখানে আসা যেতে পারে, কি বল ?

বললাম, আপনার মত ভোজনবিলাসী হলেই কেবল তা সম্ভব হতে পারে।

হেসে শিল্পী অবশিষ্ট মাংসগুলি আমার প্লেটে উজাড় করে দিয়ে বললেন, বেশ পরখ করে দেখ দেখি তুমিও শুধু রান্নার আকর্ষণে এতদূর আসতে পার কি না।

দুপুরে আবার বহির্গমন। শিল্পীর মতে বিশ্রাম নেওয়া যাবে একেবারে ফিরতি ট্রেনে। তার আগে কোথাও নিতে গেলেই হারাতে হবে অনেক কিছু। মনের স্বাস্থ্য যদি অটুট থাকে তা হোলে দেহকে সে টেনে নিয়ে যাবে অবলীলায়।

প্রথমেই ব্রাইটেন কর্ণারের দিকে চললাম। উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ মিশন দর্শন। আলমোড়ার এই আশ্রমটি স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। দেশ বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা নিরলস সেবাকার্য করে যাচ্ছেন, তাঁদের প্রয়োজন হলে চলে আসেন এই শৈলে-ঘেরা আশ্রমমন্দিরে। এখানে কর্মহীন পূর্ণ অবকাশ যাপনের মধ্যে চলতে থাকে আত্মচিন্তা। আলমোড়া শহর থেকে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে বনবেষ্টিত মায়াবতী আশ্রমটিও ঠিক এই কারণেই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আশ্রমে পৌঁছেই

শুনলাম স্বামী অপর্ণানন্দ বাইরে গেছেন। তাঁর সহকারী স্বামীজী এগিয়ে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন বসবার ঘরে। অমায়িক মিষ্টভাষী সাধু, অল্পদিন হল তিনি এখানে এসেছেন। কথাবার্তার মাঝখানে এক ফাঁকে তিনি উঠে গেলেন। কিছু পরে ফিরে এলেন হাতে দুটি প্লেট নিয়ে। ঠাকুরের প্রসাদী বাতাসা রয়েছে তাতে।

রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ফিরে আসার পথেই পড়ল কুন্দন হাউস। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বশী সেনের গবেষণাক্ষেত্র। ভেতরে ঢুকে পড়লাম। মি. সেনের সঙ্গে মিসেস সেন একটি মরশুমী ফুলের বেডের কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলেন। মিসেস সেন ইউরোপীয় মহিলা। তিনি আমাদের দেখতে পেয়ে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দীর্ঘাঙ্গ, প্রশস্ত ললাট প্রতিভাদীপ্ত মানুষটি আমাদের দিকে ফিরেই হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানিয়ে এগিয়ে এলেন। কাছাকাছি এসেই তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তোমরা ভাই বাঙালী?

এইটুকু বলেই তিনি আমাদের একেবারে অবাক করে দিয়ে তাঁর প্রশস্ত বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের স্পর্শ ছাড়া এমন উত্তপ্ত স্নেহস্পর্শ আর কোথাও পেয়েছি বলে মনে হয় না।

মিসেস সেন ততক্ষণে ঘরের ভেতর চলে গেছেন। উনি আমাদের তাঁর বাগানের এক নিভৃত কোণে নিয়ে গেলেন। সেখানে বসে আমরা আলাপ করে চললাম।

তারপর বল ভাই বাংলা দেশের খবর কি? কতদিন বাংলায় যাইনি তবু তার মাঠ ঘাট মানুষ জন সব ছবির মত ভেসে উঠছে মনে।

তারপর চলল বাংলা দেশের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক আলোচনা। কথা প্রসঙ্গে মি. সেন বললেন, দেখ ভাই, বাংলা দেশের ছেলেরা যে জীবনযুদ্ধে হটে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ আমার মনে হয় শ্রমবিমুখতা, আর তার সঙ্গে প্রতিটি কাজকে সমান

মর্যাদা দিতে হলে যে শিক্ষার দরকার তার অভাব। আমি এতদূর শিক্ষা পেয়েছি সুতরাং ঐ কাজটি করলে আমার অপমান, তাতে কাজ না থাক সেও আচ্ছা। তার ওপর শ্রমাবমুখতা তো আছেই।

একটু থেমে বললেন, অবশ্য এখন মনে হয় বাংলা দেশের ছেলেদের শ্রমবিমুখতার দুর্নামটা ধীরে ধীরে ঘুচে যাচ্ছে। এর পেছনে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনটাই কাজ করে চলেছে, কি বল? বললাম, আপনার অনুমান ঠিক বলেই মনে হয়। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।

শিল্পী বললেন, অভিশাপ একদিক দিয়ে আশীর্বাদ হয়েছে বলা চলে।

প্রায় আধঘণ্টা নানা বিষয়ে আলোচনা চলল। দেখলাম তাঁর কয়েকটি ছাত্র গবেষণা ঘরে বসে নানা ধরনের বীজ নিয়ে পরীক্ষা করছেন। উত্তর প্রদেশ সরকার ও ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ওরা মি. সেনের তত্ত্বাবধানে কাজ করছেন। প্রায় সকলেই রিসার্চ স্কলার।

আমরা চলে আসতে চাইলে মি. সেন বললেন, সে কি করে হয়, তোমরা এলে আর এখানে কিছু না খেয়ে চলে যাবে!

খেতে গেলেই অনেক দেরী হয়ে যাবে, তাই বললাম, বাজারের ওপারে রামকৃষ্ণ আশ্রমে (রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে নয়) একবার যেতে হবে, তাই একটু তাড়া আছে। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় বার শ্রদ্ধেয় সেনের প্রশস্ত বক্ষে বাঁধা পড়লাম। বললেন, তোমরা এলে আর আমার মনে হল যেন বাংলা দেশের স্বাদ পেলাম।

শিল্পী মি. সেনের একটি ফোটো তুললেন। আসার সময় বললেন, প্রবোধবাবু (সান্যাল) বলেছেন, আপনার কাছে তাঁর দেবতাত্মা হিমালয় বের হলেই পাঠিয়ে দেবেন।

খুশি হলেন মিঃ সেন। বললেন, হিমালয়ের কথা যতই সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়বে মানুষের মন ততই উন্নত হবে।

বিদায় নিয়ে ফিরে চললাম উল্টো দিকে বাজারের পথে।

শিল্পী বললেন, দেখলে, যেন বুকটা ভরে গেল। কতবড় সাধক অথচ চোখ দুটি দেখেছ, শিশুর মত আনন্দে কাঁপছে।

বাজারের ভেতর এসে পড়লাম। পথের দু দিকে তিনতলা চারতলা পর্যন্ত উঁচু বাড়ি। অধিকংশ বাড়িই শ্লেট পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি। বাড়ির প্রশস্ত কাঠের দরজায় দেবদেবী ও নানান ধর্মগুরুর মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। বাড়িগুলির নীচেই দোকান। বাজারের সারা পথে খণ্ড-খণ্ড পাথর বসান। বাজার ছাড়িয়ে আমরা নীচের দিকে নেমে গেলাম। পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আর মিনিট দুয়েক হেঁটে গেলেই আমরা রামকৃষ্ণ আশ্রমে পৌঁছতে পারব।

আশ্রমে পৌঁছলাম অপরাহ্ণ বেলায়। আশ্রমটি ছোট কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্বামীজী আমাদের ওপরে নিয়ে গেলেন। নীচে গো-পালন ও মৌমাছি-পালনের ব্যবস্থা। ওপরে গুটিপোকার চাষ।

গাছের ডাল ও পাতায় সারা ঘর ভরে আছে। প্রথম অবস্থা থেকে গুটিপোকার পাখা মেলে উড়ে বেড়াবার কাল পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায় স্বামীজী বুঝিয়ে বলে গেলেন। সারা ঘরটিতে স্বামীজী যেন গুটিপোকার সংসার পেতে রেখেছেন। এবার নীচে নেমে মৌমাছি-পালনের ঘরে এসে পৌঁছলাম। ছোট ছোট বাক্সে ঘর ভরে আছে। বাক্সগুলি যেখানে রাখা হয়েছে তার উল্টো দিকে দেয়ালে ছিদ্র আছে, যাতে বাইরের থেকে মৌমাছিরা প্রবেশ করতে পারে বাক্সের ভেতর। স্বামীজী বললেন, এদের জীবনধারা বড় বিচিত্র। অপূর্ব অনুকরণ ক্ষমতা এদের। এই দেখুন না আমাদের সুবিধে মত একটি নকল মৌচাক ওদের সামনে রেখে দিয়েছি। ওরা তাই দেখে প্রায় অনুরূপ একটি চাক বানিয়ে ফেলেছে।

স্বামীজী এর পর কতকগুলি ছবি দেখাতে লাগলেন। ছবিগুলিতে মোমাছির বিচিত্র জীবনধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। স্বামীজী

বললেন, দেখুন, মৃত মক্ষিকা কিংবা কোন আবর্জনা মৌমাছিরা তাদের মধুচক্রের ভেতর কিংবা কাছাকাছি ফেলবে না। অনেক দূরে সেগুলিকে তারা ফেলে দিয়ে আসবে। তারপর চাক রক্ষার জন্যে প্রহরী মৌমাছি রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই প্রহরীদের পরিবর্তন হয়।

মানুষের মত অপরাধীদের জন্যে এদের বিচার বসে। দোষীর শাস্তি বিধান হয়ে থাকে। এদের প্রত্যেকের আবার কর্ম বিভাগ করা থাকে। চাকের ভেতর থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করা, চাক রক্ষার জন্য প্রহরীর কাজ করা, ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসা, এইসব সহস্র রকমের কাজ।

মৌমাছিদের জীবনযাত্রার কথা শুনে অবাক লাগে। মনুষ্যেতর প্রাণিপতঙ্গেরাও যে এতখানি বুদ্ধিধর তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

ফিরে আসতে গিয়ে দেখলাম নানান আকারের কাচের জারে মধু রাখা হয়েছে। সব পাত্রের মধুর রঙ এক নয় দেখে শিল্পী প্রশ্ন করলেন, আপনার মধুগুলির রঙের এ তারতম্য কেন?

বললেন স্বামীজী, বিভিন্ন প্রকারের ফুলের মধু বর্ণেও বিভিন্ন হয়। পদ্ম সরোবরের কাছে চাক বাঁধলে মধুর যে বর্ণ পাওয়া যায়, সরষে ক্ষেতে চাক বেঁধে যে মধু পাওয়া গেল তার সঙ্গে বর্ণগত পার্থক্য থাকবেই। পাঁচমিশেলী ফুলের মধুর বর্ণও আলাদা।

আশ্রম থেকে বিদায় নেবার সময় স্বামীজী বললেন, কেমন লাগছে আলমোড়া?

শিল্পী বললেন, দেখছি, সর্বত্র মধুর সাধনা চলেছে।

হাসলেন স্বামীজী। বললেন, এ হল রাজা কল্যাণচাঁদের কীর্তি। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই তিনি এই শহরের পত্তন করেছিলেন।

বললাম, এখানে দেখছি এক একটি পাহাড়ের চূড়ায় এক এক দেবতার মন্দির। পাহাড়ীরা মনে হয় বড় বেশী ধর্মপ্রাণ।

স্বামীজী উত্তর করলেন, বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল ঘুরে দেখেছি, কিন্তু কুমায়ুনের অধিবাসীদের মত ধর্মভীরু আর সৎ বড় একটা আমার চোখে পড়েনি। তবে বড় দরিদ্র এরা।

কথা বলতে-বলতেই দুটি পাহাড়ী এসে হাজির হল। স্বামীজী বললেন, এরা আমাদের এখানে শিক্ষার্থী। মৌমাছি পালন সম্বন্ধে হাতে-কলমে পাঠ নিয়ে যায়।

স্বামীজীকে নমস্কার জানিয়ে আমরা এবার উঠে পড়লাম ওপরে। এ দিক ও দিক ঘুরে ফিরে শেষে শ্রান্ত হয়ে একটি শিলার ওপর উঠে বসলাম দু জনে। পাশেই বুনো চেরীর গাছ, গাছ ভরে ফুলের সমারোহ। যেন যৌবনের জোয়ার এসেছে। ফুলে-ফুলে মৌমাছিরা গুঞ্জন করে ফিরছে, ডালে-ডালে চলেছে চড়ুইদের চপলতা। বেশ লাগছে কুমায়ুন। বেশ লাগছে এর সন্ধ্যালগ্নটির ধীরে ধীরে নেমে আসা। শিল্পী আবৃত্তি করছেন,

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন শয়নে
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।

সন্ধ্যার আবছায়ায় পাহাড়গুলি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এল। ত্রিশূল ও নন্দাদেবীর তুষার শীর্ষে অস্তভানুর শেষ রক্তরাগ মিলিয়ে গেল। কুয়াশার গুণ্ঠনে ঢাকা পড়ল একে একে দূরের ও কাছের শৈলমালা। চাঁদ উঠল। চতুর্দশীর চন্দ্রোদয়। আবার একে একে ফুটে উঠছে পাহাড়গুলি। কেমন যেন রহস্যময়, শত শত বছরের ভাঙাগড়ার ইতিহাসকে তারা যেন তাদের শিলাদেহে লালন করে চলেছে। তৃতীয়-চতুর্থ শতকের শিলালেখ কুমায়ুনের শৈলে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। যদিও সে যুগ বড় অস্পষ্ট, ইতিহাসের লেখা সেখানে ধুলিধূসর। কবে কুমায়ুনের বুকে ক্ষত্রী রাজারা এসেছে আজ তা আর কেউ বলতে পারবেন না, তবে কাতুর উপত্যকায় (Katur Valley) বৈজনাথে তাঁদের রাজত্বের কথা আজও শোনা যায়। কুমায়ুনের কোন-কোন অঞ্চলে দেখা যায় তাদের স্থাপত্যের নিশ্চিহ্নপ্রায় দু-একটি নিদর্শন।

দশম শতাব্দীতে এলাহাবাদের সমীপবর্তী ঝুসী (Jhusi) থেকে এলেন শ্যামচাঁদ। কালি কুমায়ুনে পাতলেন তাঁর সিংহাসন।

পর্বতে-পর্বতে বিঘোষিত হল চাঁদ নৃপতিদের দৃপ্ত মহিমা। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্ষুদ্র খণ্ড পার্বত্য জাতিরা এল চাঁদ নৃপতিদের ছত্র-ছায়াতলে। তখন এই আলমোড়াতে কল্যাণচাঁদ স্থানান্তরিত করলেন তাঁর রাজধানী।

এক সময় রোহিলাখণ্ডে বসে আলি মহম্মদ খানের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কুমায়ুনের গিরী কন্দরে হয়তো হীরা মণিমানিক্যের সঞ্চয় রয়েছে, সেই স্বর্ণ-মরীচিকা তাঁকে পাগল করে তুলল। অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে (১৭৪৪) তাই কুমায়ুনের শৈল-পুরীতে চলল রোহিলা অভিযান। চাঁদবংশীয় রাজারা তখন দুর্বল। তাঁরা প্রতিহত করতে অক্ষম হলেন সেই দুর্ধর্ষ আক্রমণ।

রোহিলা সেনা আলমোড়া লুণ্ঠন করল, অত্যাচারে জর্জরিত হল নিরীহ পর্বতবাসী। কিন্তু সাতটি মাস অতীত হল না, কুমায়ুনের প্রকৃতি এই অত্যাচারীদের বিতাড়িত করল তাদের আপন দেশে। পরবর্তী রোহিলা আক্রমণ এসেছিল এর তিন মাস পরে। কিন্তু কুমায়ুনে প্রবেশের মুখেই তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

তবু থামল না রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুমায়ুনের দক্ষিণাঞ্চল থেকে এল গুর্খা আক্রমণ। তারা কালী কুমায়ুনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আলমোড়ার অভিমুখে। রাজানুচরেরা এই দুঃসংবাদ পৌঁছে দিল আলমোড়ার রাজ-দরবারে। শত্রুরা ধূলি উড়িয়ে এগিয়ে আসছে ক্রমাগত। নগরীতে অবিলম্বে শুরু হবে তাদের নির্মম হত্যাকাণ্ড। এখন পলায়ন ছাড়া প্রাণরক্ষার অন্য পথ নেই। রাজা চললেন পিতৃপিতামহের সিংহাসনের মায়া ছেড়ে। পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে, দুর্গম পথে-পথে রাজা আত্মগোপন করে চললেন। সন্ধ্যায় জ্বলল না নগরীর দীপ, মন্দিরে শোনা গেল না আরত্রিকের ঘণ্টাধ্বনি। অন্ধ-কারের অবগুণ্ঠনে আলমোড়া আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল।

এরপর চব্বিশ বছর ধরে চলল নেপালীদের রাজত্ব। বিজেতার শাসনে সুখভোগের আশা সুদূরপরাহত ছিল, তাই গুর্খাদের এই চব্বিশ বছরের শাসন অধিবাসীদের অন্তরে আঁকতে পারল না কোন স্থায়ী চিহ্ন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কুমায়ুনের শৈলে এল সর্বশেষ আক্রমণ। অনভিপ্রেত বৈদেশিক অভিযান। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল বৃটিশের রণ দামামা বেজে উঠল। শৈলে-শৈলে উঠল তার প্রতিধ্বনি। প্রাক্-গুর্খাযুগের সর্বশেষ নৃপতির মন্ত্রী হরকদেও যোশী গুর্খাদের বিরুদ্ধে ইংরাজদের সাহায্য করলেন। সম্ভবত ইংরাজদের সুপরিচিত ভেদবুদ্ধি এখানেও কার্যকরী হয়েছিল। অবশেষে কর্নেল নিকোলাস গুর্খাদের হাত থেকে আলমোড়া অধিকার করে নিলেন। গুর্খাদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে ইংরাজদের কাছে পতাকা প্রেরণ করা হল।

আলমোড়ায় গুর্খাসেনাপতি বাম্‌শার সঙ্গে লে. কর্নেল গার্ডেনার বসলেন আলোচনায়। স্থির হোল নেপালীদের কুমায়ুনের অধিকার ছেড়ে চলে যেতে হবে চিরতরে। ছেড়ে যেতে হবে তাদের সমস্ত সুরক্ষিত দুর্গ, অগণিত গিরিকন্দর আর অরণ্য আশ্রয়।

যে পথ দিয়ে নেপালীরা একদিন এসেছিল সেই পথ দিয়েই আবার তাদের ফিরে যেতে হল।

শুধু তারাই ফিরে গেল না—ফিরতে হয়েছিল একদিন কর্নেল নিকোলাস আর গার্ডেনারের স্বজাতীয়দেরও—কেবল কুমায়ুন নয়, সারা ভারতভূমি ছেড়ে।

বারংবার ভূমি সংক্ষোভের পরে যেমন আসে অনন্ত স্তব্ধতা, কুমায়ুনের শৈলমালা আজ সেই নিশ্চল স্তব্ধতার মাঝে আত্মসমাহিত হয়ে আছে।

শুধু কোন রহস্যময়ী রাত্রিতে কাকজ্যোৎস্নায় কোন সন্ধানী পথিকের কাছে সে সংগোপনে মেলে দেয় তার অস্পষ্ট ইতিহাসের কয়েকটি পাতা।

## ॥ কৌশানীর কাব্য ॥

অভূতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মিড় লাগিয়ে যায়
হৃদয়-তারে
বৃষ্টি ধারা মুখর নির্জন প্রবাসে,
সন্ধ্যা যূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে,
রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক
আপন স্খলিত উত্তরীয়ের স্পর্শ।'

অগর্ আন্ তুর্ক্-ই-শীরাজী বদস্ত্ আরদ্ দিল্-ই-মারা!
বখাল্-ই-হিন্দুয়শ্ বখ্শম্ সমরকন্দ্ ব্ বুখারা রা॥

প্রবাদ আছে তৈমুর শীরাজ অধিকার করে ডেকে পাঠান কবি হাফিজকে। দিগ্বিজয়ী সম্রাটের ডাকে কবি এলেন রাজসভায়। হাফিজের ওপরের গজলের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে সম্রাট বললেন,—যে বোখারা সমরখন্দ পাবার জন্যে আমি মরণপণ লড়াই করলাম, তুমি কিনা সেই দুটি সহরকে সামান্য এক তুর্কী মেয়ের কালো একটি তিলের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছ—এ কেমন কথা কবি?

কবি সবিনয়ে উত্তর করলেন,—সম্রাট, এ ধরণের না বুঝে ব্যয় করার জন্যেই আমার আজ এ দুরবস্থা।

উত্তর শুনে দিগ্বিজয়ী সম্রাট খুশি হয়ে রূপ-পিপাসু কবিকে তিরস্কারের পরিবর্তে পুরস্কৃতই করেছিলেন।

এখানে নিঃসন্দেহে সম্রাট রসবেত্তা তাই রক্ষে, নইলে ঐ সামান্য তিলই শেষটায় তাল হয়ে কবিকে ঘায়েল করত সন্দেহ নেই। অন্ততঃ আমাদের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। আর ঘটেছিল একেবারে অজানা পরিবেশে অপরিচিতদের মাঝখানে।

বলাই বাহুল্য এখানে বিচারকর্তারা কেউ সম্রাট তৈমুর ছিলেন না, তাই তিলটি আমাদের কপাল দোষে তাল হয়েই দেখা দিয়েছিল।

আলমোড়া থেকে কৌশানী যাবার পথে সোমেশ্বর উপত্যকায় এসে আমাদের ডাকগাড়ী থামল। এখানে গাড়ী ডাক দেবে আর নেবে, তাই আপাততঃ যাত্রাপথে ঘণ্টাখানেক অবকাশ পাওয়া গেল। অবকাশ মানে একঘণ্টার ভেতর পা চালিয়ে যতটুকু দেখে নিতে পার দেখে নাও। শৈলঘেরা হিরণ্য উপত্যকা এই সোমেশ্বর। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এখানে। এর মাটিতে সোনা ফলে—তাই এর চারদিকের পাহাড়গুলিতে ঘন জনবসতি। আমরা একটি শীর্ণতোয়া পাহাড়ী স্রোতস্বিনী ধরে এগিয়ে গেলাম খানিকদূর। ক্রমে একটি পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছলাম। এবার আমরা ঐ পাহাড় ভেঙে কিছু পথ ওপরে উঠলাম। ঘন বৃক্ষ আর লতাগুল্মে আচ্ছাদিত অরণ্য পথ। পাখিতে পাখিতে উত্তর প্রত্যুত্তর শুনতে পেলাম। সুরম্য স্থানটি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতে গিয়ে দেখি শিল্পী একটি গাছের আড়ালে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তাঁর পথ অনুসরণ করতে ইসারা করলেন। কোনরকমে একটি গাছের আড়াল হতেই শুনতে পেলাম কতকগুলি পদধ্বনি। এবার তাকিয়ে দেখি নীচের পথ ধরে কয়েকটি পাহাড়ী রমণী উঠে আসছেন। দেখেই মনে হল পূজার্থিনী, হাতে পূজার থালা, মাথায় ঘোমটা। তাদের মধ্যে একটিকে বিশেষ অভিজাতা বলে মনে হল। বয়সে কনিষ্ঠা, অন্যদের মত 'ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,' এদিকে বিচিত্র জরীর ফিতে দিয়ে পাকানো 'মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে'। নাকের নাথলীর সরু সোনার রিং-এর ওপর মুক্তো বিন্দুর দুটি বুটি বসানো। শিল্পীর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি ভিউ-ফাইণ্ডারে নিবিষ্ট হয়ে আছেন।

আশ্চর্য, আঁচ পেয়েছে মেয়েগুলি। কোন বিপদের সম্ভাবনায়

যেমন চঞ্চল হরিণগুলি থমকে দাঁড়ায় ক্ষণকাল, তারপর পথের পাতা উড়িয়ে দ্রুত চরণে প্রস্থান করে, ঠিক তেমনি পথে দাঁড়িয়ে ওরা এদিক ওদিক তাকাল, তারপর আমাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব জানার আগেই উত্তরণের পথ ধরে প্রায় দৌড়তে লাগল।

শিল্পী বললেন,—সর্বনাশ, একটিও শট নেওয়া হয়নি, চল চল—এমন চমৎকার গ্রুপ আর এত সুন্দর নাথলীর বাহার মিলবে না।

ওদের আড়ালে থেকে কিছু পথ অনুসরণের চেষ্টা করে দেখলাম কোন ফলই ফলল না, বরং আমাদের পায়ের সাড়া পেয়ে ওদের গতিবেগ বেড়েই চলল।

ওরা আমাদের কি ভাবছে সে সব চিন্তা করার অবসর ছিল না। শিল্পী বললেন,—চল, এই পাহাড়ের চাঁইগুলো ডিঙিয়ে আমরা ওপরে উঠে যাই তাড়াতাড়ি, পথ ঘুরে ওদের আসতে কিছু দেরী হবে।

তাই চললাম। লতাপাতা গাছগাছালি ধরে উঠতে লাগলাম। ওপরে উঠে আসতে আমাদের মিনিট তিনেক সময় লেগে থাকবে বোধ করি, কিন্তু উঠে এসে দেখি সামনের পথে কতকগুলি লোক বিশেষ উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা কইছে। এবার আমাদের দিকে আঙুলের ইসারা করতে লাগল তারা। ওরা সম্ভবতঃ ওপরে কোথাও থেকে আমাদের কীর্তিকলাপ দেখে থাকবে।

আমরা ওদের লক্ষ্যবস্তু, তাই কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে সেই মেয়েগুলি নীচের থেকে উঠে এসেছে। লোকগুলি তাদের পাহাড়ী ভাষায় জোর গলায় কি সব জিজ্ঞেস করতে লাগল। তাদের ভেতর দু'তিনটি মেয়ে সজোরে হাত নেড়ে তাদের কথার উত্তর দিয়ে গেল। ততক্ষণে বোধকরি কলরব শুনে এদিক সেদিক থেকে কিছু ক্ষেতিকার পাহাড়ী এসে আমাদের সামনের পথটাতে জমায়েৎ হল।

তারপর আর রক্ষে নেই। দশের দাপাদাপিতে একেবারে কুরুক্ষেত্র।

এবার ঘনঘন আমাদের দিকে অঙ্গুলী সঞ্চালন করে বোধকরি আমাদের অপকীর্তির ব্যাখ্যা করতে লাগল তারা। সত্যি ততক্ষণে ভয় পেয়ে গেছি আমরা। উত্তেজিত জনতা প্রায় মারমুখী হয়ে উঠেছে। 'আগতম্ তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্যাৎ যথোচিতম্'। বিভীষিকা সামনে এসে গেছে। যথা কর্তব্য করতে হয়। কিন্তু কি করব। মনে মনে বোবা বনে গেছি ততক্ষণে। ঋষিবাক্য মুখস্থ রাখতেই ভাল লাগে কিন্তু কাজের বেলা দেখি কেমন সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

হায় নাথলী, তুমি আমাদের এমন ফাঁদে ফেলবে জানলে কি আমরা পিঠ পেতে এতদূরে এমনি করে মার নিতে আসি।

ওরা এগিয়ে আসছে। ওদের আর আমাদের দূরত্ব আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এবার কিছু না বললে নয়। তাই হাত তুলে যথাসম্ভব রাষ্ট্রভাষায় বোঝাবার চেষ্টা করলাম, দেখ বাপু, আমাদের কোন অসৎ অভিপ্রায় নেই। নিছক সৌন্দর্য লালসাই আমাদের এই ফ্যাসাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আশা করি তোমরা আমাদের ভুল বুঝবে না।

শিল্পী তাঁর ক্যামেরাটি তুলে ধরে বলতে লাগলেন,—এই ক্যামেরায় ওদের কয়েকখানি ছবি তুলতে চেয়েছিলাম, এর বেশী আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্যই ছিল না।

কিন্তু শুধুমাত্র সৌন্দর্যের সন্ধানেই যে আমাদের এ অধ্যবসায় তা বোঝাই কাকে। এঁরা সব সৌন্দর্য-তত্ত্বে একেবারে দিকপাল। এদিকে সেই তরুণী মেয়েটি—যাকে নিয়ে এই বিপর্যয়ের সূত্রপাত, সে ইতিমধ্যে কোথায় উধাও হয়েছে

শিল্পীর কথা শেষ হতে না হতেই একটি বলিষ্ঠ পাহাড়ী যুবক এগিয়ে এসে ক্যামেরাটি তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে। তারপর পরিষ্কার হিন্দিতে বললে,—তোমরা আমাদের দেশের মেয়েদের ছবি তোল এটা আমরা কোন রকমেই বরদাস্ত করব না। আমাদের মেয়েদের যখন আব্রু থাকে না তখন তোমরা সেইসব ছবি লুকিয়ে

চুরিয়ে তুলে কাগজপত্রে ছাপাও। আমাদের সমাজে মেয়েদের ছবি তুললে সে মেয়েকে অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়। সমাজে অনেক সময় তাদের গ্রহণ করা হয় না। তোমরা বেড়াতে আস দলে দলে আর দিন দিন এমনি উৎপাত করে বেড়াও।

কথা বলতে বলতেই সে ক্যামেরা থেকে ফিল্মগুলো টেনে বের করে ফেলে দিলে। তার পেছনের লোকগুলো তখন মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলোকে শূন্যে ছুঁড়ে আস্ফালন করছিল।

দুঃখে ক্ষোভে শঙ্কায় গায়ে ততক্ষণে আমাদের শোন নদীর বান ডেকে যাচ্ছে। চরম কিছুর জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছি। কোন কিছু যেন বোঝাতেও চেষ্টা করছিলাম, এমন সময় দেখা গেল দীর্ঘদেহী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক উঠে আসছেন সামনের পথে। আশ্চর্য, তাঁর সঙ্গে আসছে আমাদের দেখা সেই তরুণী মেয়েটি। তিনি এসে পড়ায় গোলমালটা হঠাৎ থেমে গেল। লোকগুলো সসম্ভ্রমে তাঁকে পথ ছেড়ে দিলে।

তিনি পাহাড়ী ভাষায় ওদের সম্ভবতঃ ধমক দিতে লাগলেন। দেখলাম টুঁ শব্দটি নেই; লোকগুলো আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ল। সেই বীর যুবকটি দু'এক কথা বলতে গিয়ে আবার ধমক খেল। তারপর সেও শিল্পীর হাতে ক্যামেরাটি তুলে দিয়ে পায়ে পায়ে ভাগল সেখান থেকে।

এখন মুখোমুখি রইলাম আমরা চারজন। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেছে ততক্ষণে। দেখি মেয়েটির নাকে যে নাথ্‌নীটি ছিল সেটি আর দেখা যাচ্ছে না।

তরুণীটি হাসছিল। সে হাসিতে যোগ দিলে নিজেদের কেমন যেন নির্বোধ বলে মনে হবে, আর না যোগ দিলে আমরা যেন শঙ্কিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থাটা হারিয়ে ফেলেছি এটাই প্রমাণিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় কথা কইলেন ভদ্রলোক, গলার স্বর বেশ বলিষ্ঠ অথচ সহজ স্বাভাবিক,—আপনারা বুঝি বেড়াতে এসেছেন?

বললাম,—আজ্ঞে হাঁ।

কোত্থেকে?

কলকাতা।

হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন,—দোষ নেবেন না এদের। এখনও কুসংস্কারগুলো ছাড়তে পারেনি এরা। তাছাড়া যুদ্ধের কালে বিদেশী সৈন্যেরা জোর করে শালীনতা বহির্ভূত ছবি তুলে পাহাড়ী মেয়েদের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে, তাই কাউকে এমনি ছবি তুলতে দেখলেই পাহাড়ীদের আক্রোশ আর ক্ষোভ জেগে ওঠে।

এবার কিছু প্রকৃতিস্থ হওয়া গেছে। ভদ্রলোককে দেখে মনে হল জাতিতে রাজপুতই হবেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, আপনি না এলে সত্যি অভাবনীয় কিছু ঘটে যেতে পারত। আপনাকে ধন্যবাদ দিলেও আমাদের মনের কৃতজ্ঞতা ঠিকমত জানান যায় না।

ভদ্রলোক তরুণীটির দিকে নির্দেশ করে বললেন,—যদি কিছু দেবার থাকে ত একেই দিন। ঠিক সময়ে খবরটা আমায় পৌঁছে না দিলে আপনাদের হয়ত কিছু অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে যেতে হত।

উভয়কেই করজোড়ে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

বললেন ভদ্রলোক,—যাচ্ছিলাম বাইরে, আর খানিক দেরী হলে বেরিয়েই যেতাম।

বললাম,—ভাগ্যিস বেরিয়ে যাননি, তাই এ-যাত্রায় রক্ষে পাওয়া গেল।

তরুণীটি এবার কথা কইলেন,—সোমেশ্বরের মন্দির থেকে আর কিছু সময় পরে কিংবা আগে যদি ফিরতাম তাহলে আর ওঁদের এ ঝক্কি পোয়াতে হত না। একেই বলে মন্দ ভাগ্যের যোগাযোগ। মেয়েটি হাসল, আমরাও সে হাসিতে যোগ দিলাম।

ভদ্রলোক এবার পথের ওপর দৃষ্টি ফেলে বললেন,—ইস্, ফিল্মগুলো এভাবে নষ্ট হলো কি করে! গলায় তাঁর উদ্বেগের আভাস। বললাম আনুপূর্বিক ইতিহাস।

শিল্পী ম্লান হেসে বললেন,—শুরুতেই সারা। যাঁদের ছবি তোলার জন্যে এমন কুরুক্ষেত্র ঘটে গেল তাঁদের একটিও ছবি নেওয়া হল না, মাঝের থেকে আমার সোমেশ্বরের কয়েকটি ছবি হারাতে হল।

খুব দুঃখ করলেন ভদ্রলোক। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন,—এ তোমার অন্যায় হয়েছে অহল্যা। তোমার সঙ্গিনীরা অবুঝ হলেও তুমি তো বোকা ছিলে না, তাদের একটু বুঝিয়ে বললেই হত। ওঁরা দু'চারখানা ছবি নিতেন বই তো নয়।

মেয়েটি এবার যেন সত্যিই লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হল। তার অপ্রস্তুত অবস্থাটুকু এড়াবার জন্যে শিল্পী বললেন,—অন্যায়টা বরং আমাদেরই হয়েছে। ওঁদের অগোচরে থেকেই আমরা ছবি নিতে চেয়েছিলাম।

ভদ্রলোক হেসে মন্তব্য করলেন,—তেমনি করে ছবি না নিলে ছবি ছবিই থেকে যায়—লাইফ আসে না ছবির।

কথাবার্তায় ভদ্রলোক অত্যন্ত সংস্কৃতিবান বলেই মনে হল। এদিকে ঘড়িতে চোখ ফেলে বিচলিত হলাম। সময় নেই, প্রায়, দৌড়ে গেলেই নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর বাসের কাছে পৌঁছান সম্ভব হতে পারে।

আমার উদ্বেগের কথাটুকু নিবেদন করলাম। ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—যে কারণে এই বিভ্রাটের ভেতর এসে পড়লেন, সেই উদ্দেশ্যটুকু সফল না করেই চলে যাবেন? এবার হেসে তাকালেন মেয়েটির দিকে।

শিল্পী বললেন,—দুর্ভাগ্য, সে সম্ভাবনাটুকু আর নেই। কাছে কোন ফিল্মই নেই যে ছবি তুলি। সব বাসে ফেলে এসেছি।

আমি কথা যোগ করে বললাম,—তাছাড়া ওঁর নাকের যে বিশেষ অলঙ্কারটির আকর্ষণে এই ছবি তোলার আয়োজন তা দেখছি এখন অনুপস্থিত।

এবার নাকের ওপর দুটি হাত চেপে মেয়েটি সশব্দে হেসে উঠলেন।

আরও তিনটি কণ্ঠের কলধ্বনি সংযুক্ত হল সেই সঙ্গে।

ভদ্রলোক বললেন,—যাচ্ছেন কোথা?

কৌশানী।

এবার যেন তিনি কিছুটা কর্তৃত্বের সুরেই বললেন,—কাজ নেই আজকে কৌশানী গিয়ে, আগামী পরশু আমাদেরও যাবার কথা আছে—এক সঙ্গেই হিমালয় দর্শন করা যাবে।

শিল্পী বললেন,—আচ্ছা তা না হয় হল, কিন্তু সোমেশ্বরে হোটেল মিলবে তো?

হেসে বললেন ভদ্রলোক,—তা চেষ্টা করলে মিলতে পারে, তবে হোটেলের মালিকের অতিথিপরায়ণতায় পাছে কোন কলঙ্ক রটে তাই আগে থেকেই তাকে কিছুটা সাবধান হয়ে থাকতে হয়। অতিথিদের কাছ থেকে তাই কোন কিছু নেওয়ার রেওয়াজ এখানে নেই।

চঞ্চলচক্ষু মেয়েটির দিকে তাকালাম। চোখ বেয়ে তার হাসি উপচে পড়ছিল।

বললাম,—তাহলে বিছানাপত্রগুলো বাস থেকে নামিয়ে নেবার ব্যবস্থা করি গিয়ে। বাস ছাড়তে আর ত দেরী নেই।

ভদ্রলোক বললেন,—ব্যস্ত হতে হবে না আপনাদের, যা করবার আমিই করছি।

তরুণীটির দিকে ফিরে বললেন,—অহল্যা তুমি এঁদের নিয়ে যাও, আমি আসছি।

তর তর করে নেমে গেলেন ভদ্রলোক নীচের পথে। কিছুটা শ্রদ্ধা, কিছু বা বিস্ময়ে তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আসুন, অহল্যার ডাকে চমক ভাঙল। এখন তরুণীটিকে অনুসরণ করে ওপরের পথে আমরা উঠতে লাগলাম।

জীবনে অনেকগুলি মুহূর্ত আসে যাকে মানুষ স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে না, তাই তাদের নাম দেয় অভাবনীয়। নিজ্ঞা

চলিষ্ণু জীবনের দেখাশোনা এবং ঘটে ওঠার বাইরে হঠাৎ অচেনা পথ ধরে এই মুহূর্তগুলির আবির্ভাব ঘটে আর অমনি এই সব অনভ্যস্ত বিচিত্রের দর্শন ও আস্বাদ পেয়ে আমরা পুলকিত হই। চিরাভ্যস্ত জীবনের সুনির্দিষ্ট পথের বাইরে এই বঙ্কিম বৈচিত্র্যগুলি আমাদের কাছে তাই পরম রমণীয় আর স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

চলতি পথের আলাপচারীতে যতটুকু জানা গেল তাতে বুঝলাম —ভদ্রলোক মিঃ জগদীশ প্রসাদ অরোরা, আর পথ-প্রদর্শিকা তাঁর মাতৃহীনা ভাগিনেয়ী। মামা অবিবাহিত। অহল্যা মামার সঙ্গে সঙ্গে কখনো দিল্লী, কখনো পুরী, কখনো বা এই সোমেশ্বরে কাটায়। সম্প্রতি অহল্যা লেডি-হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। একমাত্র যমজ ভাই আসাম সরকারের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করছেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম মিঃ অরোরার ডেরায়।

মিঃ অরোরার ঘরখানি একটি ঢালু পাহাড়ের গায়ে। কয়েকটি উন্নতশীর্ষ দেবদারু স্থানটিকে মনোরম করে তুলেছে। বাগান পেরিয়ে গৃহ প্রবেশের পথ। বড় একটি পাথরের গা বেয়ে আমাদের নামতে হচ্ছিল। যদিও পাথরের গায়ে সিঁড়ি কাটা ছিল তবু নামতে নামতে অহল্যা সাবধান করে দিলে,—শেওলা পড়ে পিছল হয়েছে, সাবধানে পা ফেলবেন যেন।

ঘরের সামনে উঠোনে এসে নামলাম। অজস্র অযত্ন বর্ধিত বনকুসুম স্থানটিকে একটি বন্য সুষমা দান করেছে।

বারান্দায় দু'খানি বেতের কেদারা পড়ে ছিল। অহল্যা আমাদের সেখানে বসতে বলে ভেতরে চলে গেল। চেয়ারে বসলাম। সামনেই সোমেশ্বরের উপত্যকার একাংশ দেখা যাচ্ছে সেই ক্ষীণস্রোতা গিরিতটিনী উপত্যকার বুকে পড়ে আছে, মনে হচ্ছে, কোন রূপসী যেন চলতি পথে তার রূপোর সরু চিকন হারছড়াটি ফেলে গেছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র বুনো ফুল আর লতা উঠে এসে ঘরের চারদিকে অকৃত্রিম কুঞ্জবন সৃষ্টি করেছে। নানা রঙের ফুল। লতার গায়ে সাদা ফুলের ছড়া, কি বাহার খুলেছে! ছোট ছোট সোনালী রঙের ফুল পাতার ফাঁকে ফাঁকে খুশি ছড়াচ্ছে। ওদিকে সাদা চাঁপ ফুলের স্তবকে গাছ ভরে আছে। পশ্চিম প্রান্তের চেরীগাছের সবটুকু দেখা যাচ্ছে না। ফিকে গোলাপী ফুলে ছাওয়া একটি ডাল সে পাঠিয়ে দিয়েছে কাঠের কার্ণিশের গা ঘেঁষে এপারে। একটি ছোট পাখি শূন্যে স্থির হয়ে ফরফর পাখা টানছে, আবার উড়ে এসে ঐ ডালটিতে বসছে, আবার বসতে না বসতেই উড়ে পালাচ্ছে, আবার আসছে। বোধ করি খুশিতে সে অস্থির। মনে হচ্ছে পাহাড় মূক নিরুত্তর নয়, তার প্রাণের কথাগুলি ডালে ডালে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

কিছু পরেই এল অহল্যা। চোখে মুখে তার প্রশ্ন চিহ্ন দেখে বললাম,—বলে ফেলুন বক্তব্যটুকু।

হেসে মুখ নেড়ে প্রশ্নের গুরুত্বটুকু সম্ভবতঃ খানিক হালকা করে নিয়ে বলল,—আচ্ছা এখন বলুন তো আমিষ না নিরামিষ।

শিল্পী বললেন, আমাদের সবেতেই অভ্যাস। আপনার যা খুশি তাই করুন।

অহল্যা চলে যাচ্ছিল। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি নিরামিষ আহার করি, এদিকে মামা আবার ঘোরতর আমিষাশী। রোজই ত্ব'ধারার রান্না চলে, সুতরাং আপনাদের যেমন খুশি তেমনি পরিবেশন করা হবে।

হেসে বললাম,—ত্ব'ধারার মিলন যদি সম্ভব হয় তাতেও কোন আপত্তি নেই।

শিল্পী আমার কোটের প্রান্ত ধরে টান দিলেন।

অহল্যা হেসে বললেন,—এ ঠিক আমার ইঞ্জিনিয়ার দাদাটির মত কথা বললেন। ওর আমিষ নিরামিষ ত্বদিকেই সমান আগ্রহ।

অহল্যাকে দেখে কেন জানি না আমার ছোট বোন সীমার

কথাই মনে পড়ছিল বারবার। খুশিভরা মুখখানি একটি স্বচ্ছ আয়না যেন, মনটি তার ওপর চেয়ে আছে।

মনের কথাগুলি বললাম অহল্যাকে।

সীমার সঙ্গে মিল আছে জেনে কি খুশি তার। চোখ দুটি যেন আনন্দে কাঁপতে লাগল। বলল, তাহলে আপনি আমার দাদাজী। কথা ক'টি বলেই মনের খুশি চাপতে চাপতে সে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

এবার শিল্পীর দিকে ফিরে বললাম, টানছিলেন কেন দাদা, কিসের ইংগিত?

শিল্পী বললেন,—তোমাকে তো কিছু বলতে চাইনি—বলতে চেয়েছিলাম তোমার ঔদরিক স্বভাবটাকে। সবে এসে পড়েছি, তাও আবার এক অঘটনের ভেতর দিয়ে, এরই ভেতর এতটা সহৃদয়তা যেন সইছে না। মনে হচ্ছে এ সব কি সত্যি।

বললাম, আমার কাছেও সারা পরিস্থিতিটাই বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। তাছাড়া মেয়েটির জড়তা-মুক্ত ব্যবহার মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে, কি বলেন?

এ বিষয়ে শিল্পী বিশেষ সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

কিছু সময় কথায় বার্তায় কাটল। আবার বাইরে এল অহল্যা; এবার সঙ্গে তার একটি বছর বারো বয়সের পাহাড়ী মেয়ে। ছোট মেয়েটি একটি টুল বয়ে আনছিল, অহল্যার হাতে ট্রে। টুলের ওপুর ট্রেটি রাখা হল। দুটি কাপে গরম দুধ, প্লেটে কয়েকটি কলা আর টোষ্ট।

শিল্পী হাসলেন, বাসে আমাদের খাবারগুলো সব নষ্ট হল, তবে আপনার খাবার দেখে তাদের জন্যে আর তিলমাত্র আফশোষ হচ্ছে না।

অহল্যা হাসল, একেবারে খাঁটি নিরামিষ আহার দাদা।

বললাম, এমনটি রোজ পেলে ত বর্তে যাই।

বলতে বলতেই মিঃ অরোরা হাজির হলেন। দেখলাম সঙ্গে কোন লোকজন নেই, একাই এসেছেন। বেডিংগুলোর জন্যে চিন্তিত

হয়ে পড়লাম। তাহলে কি মিঃ অরোরা বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছবার আগেই গাড়ি ছেড়ে গেছে!

অরোরা প্রথমে কোন কথা না বলেই আমাদের টেবিলের খাবারগুলোর দিকে তাকালেন। তারপর চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, একেবারে নিরামিষ জলখাবার ভদ্রলোকেরা খাবেন কি করে। অন্ততঃ একটি ডিমের অমলেট দেয়া উচিত ছিল অহল্যা।

দেখলাম অহল্যা মামার কথার কোন জবাব দিচ্ছে না, মুখে হাত রেখে হাসছে শুধু।

আমরা তো মহা বিব্রত।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলতে লাগলাম।

মিঃ অরোরা বললেন, প্রোটিন ছাড়া পাহাড়ী জায়গায় চলবে কি করে মশায়। ডিম মাংস এসব নইলে চলে?

অহল্যা এবার কথা বলল, দেখছেন না, আপনাদের চললেও মামা কিছুতেই সে কথা স্বীকার করবেন না। যিনি আসবেন তাঁকেই নিজের দলে টানা চাই।

এবার মিঃ অরোরার দিকে ফিরে বলল, এ তোমার অন্যায় মামা, নিজের দলটি ভারী করছ।

ভেতর থেকে সেই কিশোরী মেয়েটি একটি কৌচ নিয়ে এল। অরোরা তার ওপর বসলেন। বসেই আর এক দফা আদেশ জারী হল, জলযোগে যা করেছ করেছ, মধ্যাহ্ন ভোজনে যেন ভদ্রলোকদের বিব্রত না করা হয়।

অহল্যা বলল, সে তখন দেখা যাবে। এখন বলতো তোমার জন্যে কি আনব।

অরোরা নরম হয়েছেন ততক্ষণে, আমি ত জলযোগ করেই বেরিয়েছিলাম মা। খাবার দরকার এখন আর হবে না, তবে এক কাপ চা দিতে পার।

অহল্যা ভেতরে চলে গেল।

সভয়ে বললাম, গাড়ির হদিশ পেলেন?

ড্রাইভারকে বলে দিলাম, কৌশানীর ডাকবাংলোয় হবিবের জিম্মায় যেন আপনাদের বেডিংগুলো রেখে যায়,—জবাব দিলেন মিঃ অরোরা। আশ্বস্ত হলাম।

মধ্যাহ্নে আমিষ নিরামিষ ছুটিই পড়ল পাতে। অহল্যা বলল, এবার সত্যি করে বলুন কোন ধারার রান্না আপনাদের ভাল লাগছে?

ছুকূল বাঁচিয়ে বললাম, ছুদিকেই দেখছি সমান হাত তোমার।

শিল্পী বললেন, আমার কিন্তু আজ নিরামিষের দিকটাই ভাল লাগছে।

অরোরা বললেন, রান্নার ব্যাপারে ঐদিকেই ওর পক্ষপাতিত্ব রয়েছে কিনা, তাই নিরামিষ আপনার ভাল লেগেছে।

এবার কপট ক্রোধে অহল্যা ফেটে পড়ল, এমন করে ছুর্নাম দিলে আমি আর আমিষ ছোঁবই না দেখে নিও।

মিঃ অরোরা সশঙ্কিত স্বরে বললেন, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি এখুনি।

মিঃ অরোরার অসহায় উক্তিতে ভোজের আসর হাস্যমুখর হয়ে উঠল।

বড় ভাল লাগছে এই অভাবিত পরিবেশের ভেতর এসে পড়ে। পরিবেশটি এরই ভেতর কেমন সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ছুপুরে বিশ্রামের পর নতুন জায়গাটি ঘুরে দেখতে বের হলাম। মিঃ অরোরা বাড়ীতেই রইলেন, অহল্যা চলল আমাদের সঙ্গে। যাত্রার আগেই অহল্যা বলল, যদি ফিরতে দেরী হয় তাহলে কিন্তু রাতের খাবারের জন্যে আমাকে দায়ী করবেন না যেন।

বললাম, ঘুরে ফিরে মন যদি ভরে তাহলে না হয় তোমার বিষয় বিবেচনা করে দেখা যাবে।

পাহাড় থেকে পাহাড় পেরিয়ে চলতে লাগলাম আমরা। ছোটখাট মাটির প্রলেপ দেওয়া বাড়ী ঘরও চোখে পড়ল। পাথরের দেয়াল দেয়া ঘরেরও অভাব নেই। এ অঞ্চলের প্রায় সবাই

অহল্যার পরিচিত। অহল্যার মামা মিঃ অরোরা সোমেশ্বরের স্বর্ণ উপত্যকায় যে কেবল আলুর চাষ করছেন তা নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগ ডাক্তারীর মাধ্যমে। হোমিওপ্যাথীতে নাকি তাঁর অসাধারণ হাতযশ। অবশ্য মিঃ অরোরার রোগী দেখা মানেই দাতব্য চিকিৎসা। ভাগিনেয়ী অহল্যা মামার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত ও প্রিয় হয়ে উঠেছে।

পথের ধারে একটি জরাজীর্ণ ঘর পড়ল। ঘরের দাওয়ায় বসেছিল এক পাহাড়ী। অহল্যাকে দেখে উঠে এসে নমস্কার করল।

কেমন আছে তোমার বউ ?—শুধাল অহল্যা।

এখন অনেকটা ভাল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আজ সারাটা দিন কাটাল। বাচ্চাগুলো ক্ষিধের জ্বালায় কান্না জুড়েছে।

এবার ধমক দিল অহল্যা, তুমি তাদের দুখানা রুটি তৈরী করে দিতে পার না ? কখন বউ-এর ব্যামো সারবে তার জন্যে হাঁ করে বসে আছ ?

মনে হল লোকটি খুব সঙ্কুচিত হয়েছে।

বলল, অহল্যামায়ী, ভাঁড়ারের চাবিটাও হারামজাদী কোথা লুকিয়ে রেখেছে।

সাঁঝে টঙ্ককে পাঠিয়ে দিও আমাদের বাড়ী, ওষুধ নিয়ে আসবে, বলতে বলতে অহল্যা এগিয়ে চলল।

পথ চলতে অহল্যা কথা বলল, জানেন দাদা, ঐ বাড়ীর বউ-এর কি অসুখ ?

বললাম, ওর ঘরের অবস্থা দেখে আর যাই হোক অতি ভোজনের অসুখ বলে ত মনে হয় না।

অহল্যা বলল, অসুখটা মানসিক। কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলের বিচিত্র ধর্ম বিশ্বাস আর সংস্কার থেকে এই মানসিক ব্যাধির জন্ম।

বললাম,—সে কি রকম ?

বলতে লাগল অহল্যা, এদের ভেতর ঘুরে ঘুরে আমি এদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত সব

জিনিষের খোঁজ পেয়েছি। আপনারা কিছুদিন এদের সঙ্গে মেলামেশা করলে থিসিস লেখার পর্যাপ্ত মালমশলা পেতে পারেন।

হেসে বললাম, সে চেষ্টা না হয় করা যাবে, কিন্তু ঐ মেয়েটির সঙ্গে পাহাড়ীদের সংস্কারের কি যোগ আছে তা ত বললে না।

অহল্যা বলল, আমাদের রোগিণীটি তার সতীন দেবীর কাছে জব্দ হয়েছে।

সকৌতুকে বললাম, সে আবার কি?

অহল্যা বলে চলল, ঐ যে লোকটা দেখলেন, ওর স্বভাবটা খুব ভাল ছিল না। লোকটা ওর বউ-এর ওপর দিনের পর দিন এমনি অত্যাচার চালাতে লাগল যে একদিন বেচারী গলায় কাপড় জড়িয়েই মারা গেল। অবশ্য আত্মহত্যা না করলে এই লোকটাই কোনদিন না তাকে শেষ করে ফেলত।

কথার মাঝেই বললাম, আচ্ছা, ওদের ভেতরে কি ইচ্ছানুযায়ী পতিগ্রহণের প্রথা নেই?

কেন বলুন তো?

তাহলে অন্ততঃ মেয়েটি দুষ্ট স্বামীটিকে তালাক দিয়ে অন্য কোথাও পালাতে পারত।

অহল্যা বলল, আমি যতদূর জানি এদের সমাজে তা হবার নয় দাদা। স্বামী মারা গেলে অনেক ক্ষেত্রে দেবরকে এরা গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু সচরাচর অন্য কোথাও চলে যায় না।

তারপর অহল্যা হেসে বলল, আসল কথা থেকে আমরা সরে এসেছি, এখন সেই মেয়েটির কথাতেই ফেরা যাক। মেয়েটি মারা গেল আর ঐ লোকটিও দ্বিতীয়বার বিয়ে করল। এখন সংসার করতে গেলেই ছোট বড় অঘটন ঘটে। কিন্তু এদের বিশ্বাস, সবকিছু অঘটনের মূলে রয়েছে ঐ আগের বউটি। তাকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তাই ঘরের ভেতর পাথর বসিয়ে তার মাথায় সিঁদুর দিয়ে এই সতীন দেবীর প্রতিষ্ঠা। পরবের পিঠে, মিষ্টি,

কলা, পেঁপেটা এঁকেই আগে দিতে হয়। কারণ ইনি ক্রুদ্ধা হলে সারা সংসার যাবে রসাতলে।

কিছুদিন আগে লোকটির একটি ছেলে মারা গেছে সাপের কামড়ে। তার থেকে তার মায়ের ধারণা হয়েছে যে কোন কারণে সতীন দেবী কুপিতা হয়েছেন তার সংসারের ওপর। এই ভাবনার ভূতে তাকে পেয়ে বসেছে।

বললাম, এমনি সতীন দেবী কি কুমায়ুনের অন্যত্রও আছে নাকি?

—যেখানে সেখানে দেখতে পাবেন—বলল অহল্যা, শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ রাজপুত ছাড়া অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর আদিবাসীদের ভেতর দেখবেন দেবতার চেয়ে অপদেবতার কদর বেশী। কিছুকাল আগে ওদের একটি অদ্ভুত প্রথা ছিল। যেমন ধরুন দুইদলের ভেতর যুদ্ধে কতকগুলি লোককে খুব যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হল; এখন ঐ মৃত লোকগুলিই বিজয়ীদের কাছে দিনের পর দিন পূজো পাবে। তার কারণ মৃত লোকগুলো অপদেবতা হয়ে তাদের অশেষ ক্ষতি করতে পারে, তাই মৃতদের নানাভাবে পূজো আচ্চার ভেতর দিয়ে তুষ্ট করতে হয়।

শিল্পী বললেন, সত্যি বিচিত্র এদের সংস্কার!

অহল্যা বলল, এদের আরও কতকগুলি অদ্ভুত অনুষ্ঠান আছে। যেমন ধরুন, এ গাঁয়ের একটি মানুষ দূর কোন গাঁয়ে মারা গেল; তখন ঐ মানুষটির পরিজনেরা কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে না। ঐ মৃত মানুষটির হাড় বা ভস্ম তার স্বগ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেই হবে, নইলে মানুষটির আত্মার তৃপ্তি হবে না।

বললাম, বটেই তো, ঘরে ফিরতে কার না ইচ্ছে করে বল।

অহল্যা বলল, আবার দেখুন, এই নিয়ে আসার রীতিটিও বড় মজার। পাহাড়ী পথের যেখানে আঁকবাঁক রয়েছে কিংবা যেখানে নদী বা ঝোরার ওপর পুল পেরিয়ে আসতে হবে, সেখানে ওরা বেশ কিছু পথ সূতো বেঁধে রেখে আসে। ওদের ধারণা

জটিল পথে বহু দূর থেকে আত্মার নিজের গাঁয়ে ফিরে আসতে মাঝে মাঝে কষ্ট হতে পারে। তাই ঐসব সুতোর সংকেত থাকলে সহজেই পথ চিনে আসতে পারবে। এমনি সব অদ্ভুত সংস্কারে ভরা ওদের জীবনযাত্রা। থামল অহল্যা।

ভাল লাগছিল কুমায়ুনের এইসব বিচিত্র জীবনযাত্রার কথা শুনতে। বিশ্বের সাগর প্রান্তর অরণ্য অচলে কত বিভিন্ন জাতি তাদের বিচিত্র মনের ভাব-ভাবনাগুলিকে নিরন্তর লালন করে চলেছে। এই ভাবনার থেকে জন্ম নিচ্ছে তাদের সংস্কার, আবির্ভূত হচ্ছে সংখ্যাতীত দেবতা—অসংখ্য ভাবনার যেন গণনাতীত রূপমূর্তি। মায়ামুগ্ধ মানুষ আপনিই যে তার ভাগ্যস্রষ্টা সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে আপন কল্পিত সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে।

বললাম, অহল্যার কাছে আজ অনেক কিছুই শোনা গেল। শিল্পী হেসে বললেন, শুধু শোনা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ঋণের জালেও জড়িয়ে পড়লাম।

এবার কপট হেসে অহল্যা বলল, কেবল ঋণ স্বীকার করলেই তো আর নিষ্কৃতি মিলবে না, ঋণ শোধ দিতে হয় এখানে।

তাই নাকি! বল কেমন করে দেব?

মিথ্যে নয় দাদা, একেবারে খাঁটি কথা। একটি ঘটনা বলছি শুনুন, বলতে লাগল অহল্যা, কয়েক দিন আগে ও পারের পাহাড়ে এক বুড়ো মারা যাচ্ছিল। খবর পেয়ে আমি আর মামা সেখানে হাজির হলাম। বুড়ো এ অঞ্চলে মহাজনী করে বেশ দু-পয়সা জমিয়েছে। প্রায় ক্ষেতিকারই ওর খাতক। আমরা গিয়ে দেখি বুড়োর বাড়ির উঠোন ভরে গেছে। বুড়োর ছেলেপুলে নেই। তার তৃতীয় পক্ষের বউটি দেখলাম উঠোনের একধারে বসে আঁচল পেতে রেখেছে মাটিতে আর যত লোক আসছে সবাই টাকা পয়সা তার ওপর ফেলে দিচ্ছে।

আমরা বেশ খানিক অবাক হয়ে গেলাম। বাড়িতে এমন মুমূর্ষু পড়ে আছে আর লোকগুলো তাকে দেখা তো দূরের

কথা, ঋণের হিসেব করছে তার বউ-এর সঙ্গে। দেখলাম, কে আগে টাকা দেবে তাই নিয়েই কথা কাটাকাটি চলেছে তাদের ভেতর। কিছু পরে বুড়ো মারা গেল। একদল 'জয় মহদেও' বলে বেরিয়ে গেল; তাদের দেখে মনে হল না যে তারা এ ব্যাপারে খুব দুঃখ পেয়েছে। ততক্ষণে আর-একদল লোক অত্যন্ত বিমর্ষ হয়েছে বলে মনে হল। তারা উঠোনের একধারে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। খোঁজ নিয়ে একটা মজার খবর জানলাম। বুড়োর জীবিত অবস্থায় যারা ঋণ শোধ দিতে পারল তারা নাকি মহাজনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল, আর যারা তা দিতে পারল না, তাদের ভাগ্যে রয়ে গেল অশেষ দুর্গতি।

এদের ধারণা, যারা ঠিক সময়ে ঋণ শুধতে পারল না, এই মহাজন বুড়ো তাদের ঘরে ছেলে কিংবা নাতি হয়ে জন্মাবে, আর অল্প বয়সে মারা গিয়ে তাদের মনে অশেষ দুঃখ দিয়ে যাবে।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ঋণ শোধ না করলে দুর্গতির চরম। অহল্যার বলার ধরনে সবাই হেসে উঠলাম।

এবার পা চালালাম সোমেশ্বরের মন্দিরের দিকে। মন্দিরটি প্রাচীন। কয়েকটি দেওদার গাছ এ দিক ও দিক দাঁড়িয়ে আছে, দু-চারটি পাহাড়ী রমণী মন্দিরে পূজো দিয়ে ফিরছিল। বিগ্রহকে নমস্কার করলাম।

আধুনিক আলোকপ্রাপ্তা অহল্যার দিকে তাকালাম। চোখ-দুটি কখন তার বন্ধ হয়ে গেছে। যেন বাস্তব জীবনের স্পর্শ থেকে নিজের নিভৃত মনটিকে রক্ষা করছে সে দুটি নয়নের দ্বার রুদ্ধ করে। নিভৃত মনোমন্দিরে প্রাণের দেবতাকে বরণ করে নিচ্ছে অন্তরের আকুলতায়।

ভারি ভাল লাগছে এই তদ্গত রমণীমূর্তি, আর অপাপবিদ্ধ মুহূর্তটি।

পুরানো জীর্ণ মন্দির সোমেশ্বর, শুধু সোমেশ্বর কেন, কুমায়ুনের কৈলাস, মুক্তেশ্বর, কাশীপুরের মন্দিরগুলিও গঠন-কারুশিল্পের দিক

থেকে নগণ্যই বলতে হয়, তবু রিক্ত সন্ন্যাসী শিবের কি ঐশ্বর্য! সর্বহারা হয়েও তিনি সর্বেশ্বর। দিল্লীর বিড়লা মন্দিরের কাছে পার্থিব ঐশ্বর্যে কেদার নাথ, বদরীনাথের কতটুকুই বা তুলনা করা চলে, তবু কেদার বদরীর আকর্ষণ মানুষের কাছে অপ্রতিরোধ্য কেন? এ কেনর উত্তর যুক্তির ওপর নির্ভর করে না, যিনি বাক্যাতীত তাঁর আকর্ষণ এসে পৌঁছয় একেবারে আমাদের নিভৃত প্রাণের গোপন অন্তঃপুরে। তাঁর স্পর্শে মনের মৃন্ময় দীপটি আলোয় ভরে যায়—দারিদ্র্য রিক্ততার মধ্যে তখনই মেলে ঐশ্বর্যের সন্ধান। তর্কাতীত, বাক্যাতীত সে অনুভূতি।

ফিরে চললাম সোমেশ্বরের মন্দির থেকে। কুয়াশা ও গোধূলি নেমে এসেছে উপত্যকায়।

দ্রুত পা চালিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম আমাদের আশ্রয়-স্থলে। সামনেই একটি গাভী হাম্বা ধ্বনিতে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। অহল্যা গাভীটির কাছে গিয়ে তার গলকম্বলে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল।

বললাম, অতিরিক্ত আদর দেওয়া কি ভাল?

অহল্যা বলল, দেখছেন না এটি আমার একমাত্র মেয়ে।

হেসে বললাম, আশ্চর্য, মেয়েটি অবিকল তার মায়ের মতই হয়েছে।

গাভীটির গলা ছেড়ে এবার অহল্যা হরিণী-বৃত্তি অবলম্বন করে কয়েক লম্ফে গিয়ে উঠল ঘরের দাওয়ায়।

শিল্পী বললেন, হাত-পা ভেঙে আমাদের সান্ধ্য চায়ের আসরটিকে আবার অচল করে দিও না যেন।

সন্ধ্যায় চায়ের আসরে আমরা জড়ো হলাম। মিঃ অরোরা ইতিমধ্যে অনেক কিছুরই আয়োজন করে রেখেছেন। প্লেটে খাদ্য-বস্তুর পরিমাণ বাহুল্যে মাঝে মাঝে মনের আতঙ্ক প্রকাশ করতে লাগলাম, আর ঠিক যেন অভিভাবকের মত মিঃ অরোরা ধমক

দিতে লাগলেন, খাব না, খাব না কি, এই তো সবে উঠতি বয়েস ; এখন না খেলে শরীর গড়বে কি করে ?

পথে পথে ঘুরে দেখেছি অনাত্মীয়দের আতিথ্যই পরম মধুর হয়ে ওঠে। নিয়মের বাঁধনে বাঁধা পড়লেই আত্মীয়তার রূপটি ম্লান হয়ে আসে। কিন্তু এই যে হঠাৎ দেখা, হঠাৎ চেনাশোনা, এর পরমায়ু হয়তো ক্ষণিকের তবু কি অমূল্য সম্পদই না এরা মনের কাছে বয়ে আনে।

কথায় কথায় মিঃ অরোরা অহল্যা আর ওর ইঞ্জিনিয়ার ভাই আনন্দের প্রসঙ্গে এলেন।

ওদের বাবা অত্যন্ত একগুঁয়ে আর খেয়ালী ছিলেন। মিঃ অরোরার দিদির ওপর রাত্রিদিন চলত নির্যাতন। প্রথম জীবনে অবস্থা ভাল ছিল না অরোরার, তাই দিদির বাড়ি ভগ্নীপতির গলগ্রহ হয়ে অনেক দিন থাকতে হয়েছিল তাঁকে। তারপর একদিন অপমানিত হয়ে দিদি আর তাঁর ছোট দুটি ছেলে মেয়েকে নিয়ে পথে এসে নামেন অরোরা। সম্বল মাত্র দিদির কয়েকগাছা সোনার চুড়ি। তাই নিয়ে একটা ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। আর আজ নিজের চেষ্টায় লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক তিনি। আট বছর হল অহল্যার মা মারা গেছেন, তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন এই মাতৃহারা ছেলেমেয়ে-দুটির ভার।

মিঃ অরোরা বিয়ে করেননি। বিয়ে করার সময়ই হয়নি তাঁর। দারিদ্র্যের পঙ্গুদশা থেকে তিনি নিজেকে তুলে ধরবেন—এই ছিল তাঁর একমাত্র অভিলাষ। তাতে সফল হয়েছেন তিনি। একটু বেশী রকমই সফল বলতে হবে। বিপদের দিনে দিদি ছিলেন তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। মা বোন দুটি মূর্তিতেই দিদি তাঁর শূন্য মনটিকে পূর্ণ করে রাখতেন।

কত দিন দিদি তাঁকে বলেছেন, ঘরে একটি লক্ষ্মীশ্রী বউ আনবার জন্যে, কিন্তু সময় কই। পরের ঘরের একটি মেয়ে আসবে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি পরিবেশে। সে চাইবে মিঃ অরোরার মনে তার ঠাঁই করে নিতে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে ? কামিনীর চেয়ে

কাঞ্চনেই তখন অরোরার চিত্ত ভরে রয়েছে। অপমান গ্লানির পঙ্কশয্যা থেকে তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে স্বর্ণ-পঙ্কজ। সেই পঙ্কজের ওপর এসে বসবেন কমলা, অন্য নারী যে স্বপ্নাতীত।

আজ অবশ্য তিনি কোনো দিক থেকেই অসুখী নন। দিদি যখন মারা যান তখন অরোরা নিজেকে বড় অসহায় মনে করেছিলেন। তারপর এই দুটি ছেলেমেয়ে তাঁর মনটাকে পূর্ণ করে দিলে। আজ তিনি পরম সুখী। অহল্যা সদ্য ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছে আর আনন্দ হয়েছে ইঞ্জিয়ার। তাদের বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসে তিনি তাদের অমানুষ করে তোলেননি—এই তাঁর আত্মতৃপ্তি।

কথা বলছিলেন মিঃ অরোরা—জীবনের কথা, সংগ্রামের কথা; বলতে বলতে মাঝে মাঝে অভিভূত হয়ে পড়ছিলেন তিনি।

বেশ লক্ষ্য করছিলাম, প্রৌঢ় ভদ্রলোক মৃতা সহোদরার কথা বলতে বলতে যখন আবেগে বাক্ রুদ্ধ হচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়টিতে অহল্যা দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি কথা তুলে তাঁকে কথান্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।

কথার ভেতরে বলিষ্ঠ দেহধারী প্রৌঢ় মানুষটির সরল সহজ একটি শিশু-হৃদয় বারে বারে অনাবৃত হয়ে পড়ছিল।

ভাবলাম, এমন নইলে কি এক ডাকে মানুষকে আপন করা যায়। চা পান শেষ হয়ে গিয়েছিল আমাদের।

অহল্যা বলল, আসুন দাদা, আপনাদের আমার বাড়ির চারদিকটা একটু ঘুরিয়ে আনি। তুমি এখানেই বস মামা। শীত পড়েছে, তোমার ঘুরে আর কাজ নেই।

অহল্যা ঘরের ভেতর থেকে একটি কম্বল এনে সস্নেহে মামার দেহে জড়িয়ে দিতে লাগল। মিঃ অরোরা তাঁর পা-দুটি অন্তত খোলা রাখতে চান, কিন্তু অহল্যা তা কিছুতেই হতে দেবে না। শেষে তাঁকে মোজা পরিয়ে তবে ছাড়ল। মৃদু হাসি ফুটে উঠছিল মিঃ অরোরার মুখে। সকালের সেই রাশভারী মানুষটি কোথায় হারিয়ে গেছে, তার জায়গায় একটি অসহায় শিশু যেন অহল্যার

কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। মামাকে বসিয়ে রেখে অহল্যা আমাদের নিয়ে গেল ঘরের পেছন দিকটাতে। কয়েকটা দেওদার গাছ পরস্পরের থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একটির পত্রান্তরাল দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। হাল্কা কুয়াশার পর্দাখানির ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে দূরের পাহাড়ে আর কাছের অঙ্গনে। এখন বন্য চেরী গাছটিকে দেখা গেল। ফিকে গোলাপী রঙের শাড়ি পরে ও দাঁড়িয়ে আছে আঙিনার এক কোণে, যেন অপরিচিতদের দেখে ও সরমে সরে দাঁড়িয়েছে। নীচের থেকে উঠোনে উঠে এসেছে একটি লতা। বড় বড় সবুজ পাতার ভেতর সাদা কুন্দ ফুলের আকারে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের ছড়া। কোন নিপুণ মালিনী একটি বড় মালা গাঁথা শেষ করেছে সদ্য—এমনি মনে হবে।

বললাম, লতাটি তো ভারি চমৎকার।

কথায় আকৃষ্ট হল অহল্যা। বলল, এটি আমার মায়ের হাতে লাগানো। এই যে আমার সঙ্গে আসুন। অহল্যার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে দেখলাম, লতাটি ঘর পর্যন্ত উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, জানলার ফাঁক দিয়ে একেবারে ভেতরের ঘরেও ঢুকে পড়েছে।

ঘরখানি মিঃ অরোরার শয়নকক্ষ। মিঃ অরোরা নাকি বলেন, তাঁর দিদি ফুল হয়ে তাঁর কাছে এসেছেন। শুঁকে দেখলাম, এক রকমের মৃদু সুগন্ধ জড়িয়ে রয়েছে লতাটির গায়। ফুল ও লতার অবয়বের ভেতর যেন একটা মমতার স্পর্শ মাখানো।

সে-দিন গভীর রাতে আর-একটা ছবি দেখতে পেলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা সবাই শুয়েছি। মিঃ অরোরার ঘরে আমাদের তিন জনের শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। নতুন জায়গায় বোধহয় মনটা চঞ্চল ছিল তাই ঘুম আসেনি। এমন সময় ঘরের পেছন দিকে মনে হল পায়ের সাড়া পেলাম।

আস্তে আঁস্তে বিছানায় উঠে বসে জানালার ফাঁকে তাকালাম।

একটি মেয়ে বসে আছে উঠোনে। দেখলাম, ঐ লতাটির গায়ে সে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত শরীরটা কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে এল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। মুখ ফেরাতেই চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম অহল্যা উঠে আসছে। কি করছিল ও এত রাতে। কাছাকাছি হতেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম, অহল্যার চোখে সদ্য গড়িয়ে-পড়া দু-ফোটা জলের ধারা।

এমনি কত নির্জন নিশীথে মাতৃহারা কন্যার অশ্রুধারায় হয়তো সিক্ত হয় মায়ের সজীব স্মৃতিচিহ্নটুকু। ঘরে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ করল অহল্যা—আওয়াজ পেলাম।

পরের দিন খানিক বেলায় উঠলাম। উঠে দেখি ইতিমধ্যে ঘরদোর ঝাড়ামোছা হয়ে গেছে। আমাদের ঘরে কাল যে টিপয় আর টেবল চেয়ার পাতা দেখছিলাম, সেগুলি কখন তাদের সাজ বদলে ফেলেছে। হাতের চমৎকার কাজ-করা সব বাহারী ঢাক্না দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে তাদের প্রায় অনাবৃত দেহগুলো। ফুলদানিতে সদ্য তোলা ফুলের বিচিত্র বিন্যাস। বেলায় ওঠার জন্যে একটু লজ্জিত হলাম। শিল্পী আগেই শয্যা ছেড়ে গেছেন, সম্ভবত তিনি বাইরে কোথাও বেরিয়েছেন। রাগ হল মনে মনে। কেমন মানুষ, একবার আমায় ডাক দিলেই ত পারতেন। গায়ের থেকে কম্বল সরিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, সামনে চায়ের কাপ হাতে এসে দাঁড়াল অহল্যা। সদ্যস্নাতা অহল্যার চরণে আজ চঞ্চলতা, পরণে একটি বাসন্তীবর্ণের শাড়ি। তাকে দেখে মনে হল—

সূর্য প্রদক্ষিণ করি ফিরে সে পূজার নৃত্যতালে ভক্ত উপাসিকা।

বললাম, ব্যাপার কি অহল্যা!

মৃদু হেসে বলল, কই কিছু নয় তো দাদা।

তার হাতের থেকে কাপটা নিয়ে বললাম, সত্যি তোমাদের খুবই অসুবিধে ঘটিয়েছি। এত বেলা হয়ে গেছে তবু রাতের বিছানাটা ছেড়ে দিইনি।

হেসে বলল ও এ বাড়ি কুম্ভকর্ণ নিবাস। যতক্ষণ খুশি ঘুমুতে পারেন এখানে। কারো কোন মানা নেই।

বিছানা ছেড়ে বাইরে এলাম। দেখি মিঃ অরোরার পাশেই দেয়ালের আড়ালে শিল্পী বসে আছেন।

মিঃ অরোরা সুপ্রভাত জানালেন।

শিল্পী মন্তব্য করলেন, নতুন জায়গায় দেখছি তোমার বেশ সুখনিদ্রা হয়েছে।

চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, মশায়, আপনারই বা এহেন অনিদ্রার কারণ কি? সংসার ছেড়ে এসেছেন বলেই কি 'নিদ নাহি আঁখি পাতে'। কলকাতায় ত ন'টার আগে কুম্ভকর্ণ সাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হত না---তবে এখানে এমন ব্রাহ্ম মুহূর্তে ওঠা কেন?

কিন্তু মুখে কিছু না বলে অপরাধীর হাসি হাসলাম মাত্র।

আর-এক দৃশ্য চোখে পড়ল। মিঃ অরোরার সামনে একটি টেবিল। টেবিলের ওপর একটি লজেন্সের জার আর বিস্কুটের কৌটো রাখা হয়েছে।

বললান, আপনি বুঝি লজেন্স আর বিস্কুটের বিশেষ ভক্ত?

হাসলেন মিঃ অরোরা। ইশারায় দেখিয়ে দিলেন সামনের দেওদার গাছগুলির দিকে। দেখলাম কয়েকটি পাহাড়ী ছেলে গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে, মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। ব্যাপারখানা কি! মিঃ অরোরার পাশের চেয়ারখানাতে গিয়ে বসলাম।

মিঃ অরোরা চুপি চুপি বললেন, আপনাদের দেখে ওরা এখানে আসতে ভরসা পাচ্ছে না।

চোখে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন এঁকে বসে রইলাম।

হেসে বললেন মিঃ অরোরা, ওরা আমার সাঁঝ সকালের সঙ্গী, বিস্কুট আর লজেন্স ঘুষ দিয়ে ওদের আমি দলে টানতে পেরেছি।

শিল্পী বললেন, এ তো আপনার বেশ চমৎকার খেয়াল।

বলতে লাগলেন অরোরা, আগে কিন্তু আমি ওদের একটুও পছন্দ করতাম না। এটি যদিও আমার ভাড়া-নেওয়া বাড়ি, তবু শখ করে এক সময় একে সাজাতে মন গিয়েছিল। নানা ধরনের ফুল এনে লাগিয়েছিলাম বাগানে, ফলের গাছও কিছু-কিছু। কিন্তু মশাই, এদের অত্যাচারে কোন কিছুই আর রাখতে পারলাম না।

একদিন বাইরের থেকে ফিরে এসে দেখি আমার নেপালী চাকরটা কয়েকটা ছেলেকে বেঁধে রেখেছে সামনের ঐ দেওদার গাছটায়। আমাকে দেখেই ছেলেগুলো অসহায়ের মত তাকাতে লাগল।

কেমন মায়া হল। ধমক দিলাম নেপালীটাকে। বললাম, খবরদার! ওদের আসতে মানা করো না কখনো।

ছাড়া পেয়ে দৌড়। আর আসে না। কিন্তু ছোট ছেলেরা হল ভোলানাথের মতই ভুলো। তাই আবার দূর থেকে উঁকিঝুঁকি শুরু হল। তবে পাশে বড় একটা ঘেঁষত না।

শেষে অহল্যা বুদ্ধি দিলে। লোভের ফাঁদে ফেলে জয় করতে হবে ওদের। সে দিন থেকে রোজ লজেন্স আর বিস্কুটের ব্যবস্থা।

মনে মনে বললাম, এ যে প্রায় সেই 'স্বার্থপর দৈত্যের' ( Selfish Giant ) গল্পের মতই হল।

আমরা ঘরের ভেতর উঠে এলাম। দেখি একে একে পাহাড়ী ছেলেমেয়েগুলি আসতে লাগল। প্রথমে চাপা গুঞ্জন, চুপি পদসঞ্চার, তারপর কলরব আর দাপাদাপি।

কতক্ষণ পরে চলে গেল ওরা।

বেরিয়ে এসে দেখলাম, ছেলেরা একটি পাহাড়ী পথ ধরে গান গাইতে গাইতে চলেছে।

বললাম, বড় মিষ্টি সুরে গান ধরেছে তো।

ওদের গানের কথা বলছেন, বললেন মিঃ অরোরা, শীত আসছে —এবার ওদের উৎসব শুরু হবে, তাই এখন থেকেই গানের রিহার্সল চলেছে।

কিসের উৎসব ?

অরোরা হাসলেন, পাহাড়পুরীতে উৎসবের আবার অভাব আছে নাকি। বর্ষা, শরৎ আর শীতে এদের উৎসবগুলি বেশ জমে ওঠে।

শীতের সময় পাহাড়ীরা একরকম উৎসব করে তাকে বলে 'কাঠহারুয়ী'।

বললাম, কিরকম উৎসব একটু বর্ণনা করে শোনান। আমি নোট নিয়ে যাই।

বলতে লাগলেন মিঃ অরোরা, একটা ফাঁকা জায়গায় গাছের ডাল জড়ো করে ওরা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়, আর ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। তারপর ছোট ছোট ছেলেরা তাতে ফুল আর শশা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। কিছু পরে ঐ পোড়া শশা আগুনের থেকে তুলে খাবার জন্যে ওদের ভেতর কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

বললাম, আমাদের বাংলাদেশে দোলের সময় গাঁয়ের ছেলেরা এমনি করে ডালপালা নিয়ে আগুন জ্বালে, তারপর তাতে আলু বেগুন পুড়িয়ে খায়।

বিভিন্ন অঞ্চলের আচারের ভেতর কখনো সখনো এমনি সব মিল দেখা যায় বইকি, বললেন মিঃ অরোরা। শীতের সময় ছেলেদের আরও একটি উৎসব হয়। তার নাম হল 'ঘুঘুটিয়া'। এ উৎসবে ছোট ছোট ছেলেরা সকাল থেকে কাক আর অন্যসব পাহাড়ি পাখিদের দেখলেই মকাই-এর দানা, গমের দানা, আর চাল ছড়ায়। শীতের সময় খাবার পায় না পাখিরা, তাই পাহাড়িদের এই উৎসবের ব্যবস্থা।

বললাম, ঘুঘুটিয়া উৎসবের পরিকল্পনায় এদের ধর্মভীরু মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

অরোরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, শুধু কি তাই, বীজ বোনা, ফসল তোলা সব সময়েই কাজের মাঝে ওরা গান গেয়ে উৎসব অনুষ্ঠান করে। মনটাকে উৎসবের ভেতর দিয়ে বেশ সতেজ করে রাখে।

শিল্পী বললেন, রাণীক্ষেতের পথে আমরা কয়েকটি মেয়েকে ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতে শুনেছিলাম। অবশ্য পুরোপুরি গানটি শোনার সৌভাগ্য হয়নি আমাদের।

কাকে যেন ডাক দিলেন মিঃ অরোরা। দেখি ভেতর থেকে পাহাড়ী একটি কিশোরী বেরিয়ে এল।

আমাদের দিকে ফিরে অরোরা বললেন, শুনবেন জমি চষার গান?

সাগ্রহে বললাম, শুনব বৈকি, শ্রোতাদের আগ্রহের সামান্যমাত্র অভাব হবে না জানবেন।

মিঃ অরোরা বললেন, জমির মালিক একটি লোক নিযুক্ত করে। সে সকাল থেকে ক্ষেতের পাশে গিয়ে পঞ্চনামা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে গান ধরে। এক ছত্র সে গায় আর যেসব মেয়েরা বীজ বোনে তারা ঐ ছত্রটি ফিরিয়ে গায়।

কিশোরীটির দিকে তাকিয়ে বললেন, গাও তো সেই ক্ষেতচষার গানটা।

মেয়েটি প্রথমে লজ্জা পেল কিন্তু উৎসাহ দিলেন মিঃ অরোরা। চমৎকার পাহাড়ী সুরে গলা খুলে মেয়েটি গাইতে লাগল,

ইয়ে সেরি কা মতুন তুম ভোগ লাগলা হো
সেওয়া দিয়া বিদ্ হো
ইয়ে গোঙ্কা ভূমিয়া পরো দইন হয়া হো,
রোপারো তোপারো বারোবারি দিয়া হো,
হালিয়া বলদা বারোবারি দিয়া হো,
হাতো দিয়া চাও হো, বিয়োন দিয়া ফারো হো,
পঞ্চনামা দেব হো॥

গানটি ক্ষেত্রপতি গ্রামদেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। বীজ-বপন-কারিণীরা বলছে, ছায়া-ছায়া দিন যেন তাদের যায়। বাদল যেন না আসে। প্রতিটি বপনকারিণী যেন সমানভাবে তাদের হাত চালিয়ে যেতে পারে। যে লোকটি ক্ষেত চষছে আর যে বলদ লাঙ্গল টানছে,

তারা যেন সমান শক্তি পায়। দু জনের কেউ যেন না পিছিয়ে পড়ে।

এতগুলি সুবিধা পেলে তারা পঞ্চনামা দেবতাকে অবশ্যই খুশি করে দেবে। তারা মুক্তোর দানার মত ভাত রান্না করে গ্রাম-দেবতাকে প্রাণভরে খাওয়াবে একদিন।

গান শেষ করল কিশোরীটি।

অরোরা বললেন, এ তো গেল ক্ষেত্রপালক দেবতার উদ্দেশ্যে আবেদন-গীত। আরও বহু দেবতা রয়েছে এদের।

শিল্পী বললেন, গতকাল অহল্যা আমাদের অনেকগুলি অপদেবতার আখ্যান শুনিয়েছে।

অরোরা বললেন, শুধু ভয় দেখানো অপদেবতা নয়, প্রতিটি কাজে সাহায্য করবার জন্যেও পাহাড়িদের নানা দেবতা রয়েছেন।

এই যেমন ধরুন অতিবৃষ্টি হল, তখন এরা 'কুঙ্গর' নামে দেবতাটির পুজো করবে। বৃষ্টি চাই অমনি দেবতাটিকে ভেজা গমের ভেট দাও আর বৃষ্টি বন্ধ করার দরকার হলে দাও শুকনো গম।

বললাম, পরিকল্পনাটি যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নেই।

অরোরা বলে চললেন, যেমন ধরুন পশুচারণ, এটি হল পাহাড়ীদের অন্যতম একটি বৃত্তি। এখন পশু চরাতে গেলেই পাহাড় আর বনের আড়ালে দু-একটা পশুর নিখোঁজ হওয়া স্বাভাবিক। এ বিপদে রয়েছেন রক্ষাকর্তা 'রুনিয়া' দেবতাটি।

রাতের বেলায় যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন ঘোড়ায় চেপে রুনিয়া ঐ হারানো পশুগুলিকে খুঁজে খুঁজে বের করবে।

আবার যদি কোন পশু অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন রয়েছে 'সিধুয়া' আর 'বিধুয়া'—দুই দেবভ্রাতা। পাহাড়ীদের ধারণা হল, কায়মনে তাঁদের উপাসনা করলে পশু অবশ্যই রোগমুক্ত হয়ে যাবে।

কথার মাঝখানে অহল্যা এসে দাঁড়াল। আমি নোট বইতে টুকছিলাম দেবতাদের নাম-গোত্র। হেসে বলল অহল্যা, থিসিস লেখার মালমশলা সংগ্রহ করছেন বুঝি?

বললাম, সে কাজটা তোমার জন্যেই তোলা রইল। এ আমার সামান্য কৌতূহলমাত্র।

অহল্যা এবার তাড়া দিলে, চলুন ভেতরে, লিখতে গিয়ে কি খাবার কথাও ভুললেন নাকি ?

শিল্পী বললেন, নৈব নৈব চ।

প্রাতরাশের টেবিলে বসেই কথা হল, আমরা গণনাথ মন্দির দেখতে যাব। মধ্যাহ্ন ভোজন আর এখানে হবে না '

অরোরা বাড়িতে রইলেন।

অহল্যা টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরে নিল। আমাদের সঙ্গে মিঃ অরোরা একজন পথ প্রদর্শকও দিয়ে দিলেন।

অরণ্যপথ ধরে আমরা এগুতে লাগলাম। কোথাও কোথাও ঘন অরণ্যের মাঝ দিয়ে পথ করে যেতে হচ্ছিল। অপরূপ মায়াময় সে পথ! অরণ্যে পুষ্পেভরা লতার ওপর পাখি দোল খাচ্ছে। কোথাও বা নাম-না-জানা পাখিতে হঠাৎ ডেকে উঠে নিবিড় অরণ্যের নিদ্রাভঙ্গ করছে।

ছ মাইল পাহাড়ী পথ ভেঙে আমরা এসে পৌঁছলাম গণনাথ মন্দিরে।

গণনাথের মন্দির দর্শন করা হল। অহল্যা গণপতিকে পুজো নিবেদন করল। প্রসাদীর অংশ আমরা মাথায় ছুঁইয়ে মুখে চালান করলাম। তারপর ফিরলাম বনের মাঝে রেস্ট-হাউসে। সেখানে গিয়ে দেখি অন্য একটি ভদ্র পাহাড়ী পরিবার আগে থেকেই আশ্রয় নিয়েছেন। আমরাও পান্থশালার দাওয়ায় উঠে বসলাম। গল্পসল্পের ভেতর দিয়ে আর প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে এত পথ চলে এসেছি, এখন বসতে গিয়েই শ্রমবোধ করলাম।

খালি মেঝেতেই একটুখানি গড়িয়ে নেবার আয়োজন করছি দেখে পাশের পরিবারটি আমাদের একটি কম্বল দিলেন। সেই কম্বল পেতেই তিন জন বসে পড়লাম। তারপর ভোজনের পর্ব এক সময় শেষ হল। দুপুরের দিকে খানিক সময় ঘুরতে বের হলাম।

দু-দশ মিনিট ঘোরাঘুরির পরেই অহল্যার ক্লান্তি এল। পাশেই একটি গাছতলায় পাথরের চাঁই দেখে তার ওপর বসে পড়ল সে। আর পারছি না দাদা, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অহল্যা।

বললাম, পারবেই বা কেন,

'নব রসাল বন বিহরণ শীলা
সোহে কি কোকিল বিপন করিলা।' (তুলসীদাস)
নব রসালের বনে বিচরণশীলা
কণ্টক বনে কভু রহে কি কোকিলা ?

অহল্যা উঠে দাঁড়িয়ে কপট ক্রোধে বলল, অপবাদ হজম করব বসে-বসে এ হতেই পারে না। হার আমি মানিনি কারো কাছেই।

শিল্পী বললেন, হার তোমার হয়নি, হার এখন আমরাই না হয় স্বীকার করছি। এই বলে শিল্পীও বসে পড়লেন একটি শিলাখণ্ডের ওপর। দেখাদেখি আমরাও সবাই বসলাম তাঁর আশে পাশে। হাসি গান গল্পে কোথা দিয়ে কেটে গেল কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্ত।

এক সময় পথ-প্রদর্শক পাহাড়ীটির ডাকে চমক ভাঙল। এখুনি রওনা না দিলে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে।

সবাই উঠে আবার ঘরমুখো পা চালালাম। এখন আর পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল না, আমাদের টুকরো টুকরো কথা আর অহল্যার কলহাস্যে বনপথটি ক্ষণে ক্ষণে মুখর হয়ে উঠছিল। সন্ধ্যা নামল সোমেশ্বর উপত্যকায়---আর আমরাও এসে পৌঁছলাম আমাদের ডেরায়।

পরদিন প্রভাতে আবার যাত্রা। জলযোগের পর সবাই সোমেশ্বরের বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছলাম।

আমাদের আসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িরও হর্ন বাজতে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। পূর্বাহ্ণেই মিঃ অরোরা আলমোড়া থেকে সিট রিজার্ভের ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ পাহাড়ী পথে গাড়ি

নির্দিষ্ট সংখ্যক আরোহীর বেশী নিতে পারে না। এবার কৌশানীর পথে যাত্রা শুরু হল। পাহাড়ী পথে গাড়ি গড়িয়ে চলল। আঁকবাঁক পেরিয়ে গাড়ি উঠছে ওপরে আর ত্বরু-ত্বরু শঙ্কায় কেঁপে উঠছে আমাদের বুক। নীচে খরস্রোতা কোশীর প্রবাহ আর পাশে আদিম দৈত্যের মত শিলাস্তূপ। মনে হচ্ছে ছোট খেলনার এই গাড়িটিকে নিয়ে বহু নীচে ঐ শিলাকীর্ণ কোশীর বুকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে কখন। গাড়ি আরও-আরও-আরও ওপরে উঠে আসছে, কোশীকে এখন অনেক শীর্ণা দেখাচ্ছে। দু-তিন হাজার ফিট নীচে গিরিখাদ যেন অতিকায় রাক্ষসের মত হাঁ করে আছে।

পথ কি সংকীর্ণ! মনে হচ্ছে গাড়ির চাকা আর পথের কিনার কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান মাত্র। একটু অসাবধান, সামান্য মাত্র এ দিক ও দিক হলেই সেই বিরাট রাক্ষসের মুখে গিয়ে পড়তে হবে। মাঝে মাঝে গাড়ি নেমে আসছে পাহাড়ী সমতলভূমিতে। পথ সেখানে একটু প্রশস্ত। গাড়ি থামছে আর সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলে থেকে যুবক বৃদ্ধ প্রায় সকলেই ড্রাইভারকে নমস্কার জানাচ্ছে, কিন্তু কোন কথা হচ্ছে না তাদের ভেতর।

এমনি পাহাড়ী পথে উঠতে গিয়ে কোথাও কোথাও দেখেছি পথ চলতি প্রায় সবাই গাড়ির চালককে নমস্কার জানায়। এর কারণটি অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি।

তবে পাহাড়ী পথে গাড়ি চালাতে মস্তিষ্কের যে স্থৈর্য ও মনের যে দৃঢ়তার দরকার তার আশ্চর্যরকম সমাবেশ হয়েছে পাহাড়ী ড্রাইভারদের ভেতর। পলে পলে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে নার্ভকে এমনভাবে যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারা নমস্য—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সংকীর্ণ এক পথের ধারে সজোরে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। আমরা বেশ জোর ঝাঁকুনি খেয়ে এ ওর গায়ে গিয়ে পড়লাম। খাদের দিকে বসেছিল অহল্যা। হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে তখন বেরিয়ে পড়েছে। যাত্রীরা তাড়াহুড়ো করে নেমে এল।

এবার পাশে খাদের দিকে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে মাথার ভেতর ঝিম-ঝিম করতে লাগল। সমস্ত অনুভূতি যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

কয়েক শত ফিট নীচে কোশীর শিলাস্তৃত জলতলে একটি গাড়ির ভগ্নাংশ দেখা যাচ্ছে। লোহার ফ্রেমে-আটকানো চাকাগুলো ওপরে উঠে আছে। লোহার ফ্রেমটিও যেন নিদারুণ যন্ত্রণায় দুমড়ে গেছে। গাড়ির অবশিষ্ট অংশের দু-এক টুকরো এ দিকে ও দিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

আমাদের সামনের পথে দুটি পাহাড়ীকে দেখলাম। তাদের হাতে গাছের ডাল। ওরা ঐ ভগ্ন পথটুকু নির্দেশ করতেই নিযুক্ত রয়েছে ওখানে।

গতকাল এই অঘটনটি ঘটেছে। পাহাড় থেকে নয় জন মানুষ নিয়ে গাড়িটি গড়িয়ে পড়েছে একেবারে নীচের খাদে—কোশীর জলপ্রবাহের মাঝখানে। আট জন সঙ্গে-সঙ্গেই মারা গেছে। একটি মানুষ কোন রকমে বেঁচেছে---একখানা পা হারিয়ে।

কারো মুখে কথা নেই। চোখের সামনে এই অপঘাত মৃত্যুর দৃশ্যে সবাই কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কতক্ষণ পরে ড্রাইভারের ডাকে চমক ভাঙল। গাড়িতে ওঠার নির্দেশ।

শিল্পী বললেন, এর চেয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া অনেক নিরাপদ। বললাম, তাহলেও যে একেবারে বিপদ কেটে যাবে তা মনে করা যায় না। অবশ্য তাতে খাদে পড়ার বিপদ থেকে রেহাই পেতে পারেন, তবে Man-eater of Kumayun-এর সামনে পড়ার বিপদ থেকে রেহাই পাবেন কি?

মিঃ অরোরা বললেন, কোন অবস্থাতেই যখন বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই তখন যেমন আছি তেমনি থাকাই ভাল। অতএব গাড়িতে উঠে বসাই যাক।

গাড়ি ষ্টার্ট দিল, আমরা বিষণ্ণ মনে উঠে বসলাম। প্রতিটি পথের বাঁকে গাড়ি যখন পার হচ্ছিল তখন রুদ্ধ নিশ্বাসে আমরা মৃত্যুর প্রহরগুলি গণনা করছিলাম। কৌশানী প্রবেশের শেষ বাঁকটি যখন পার হলাম তখন অহল্যার আনন্দধ্বনি শোনা গেল। কি হল অহল্যা?

ছোট্ট মেয়ের মত হাতখানা চেপে ধরে বলল, অনেকক্ষণ কথা বলতে পারিনি কিনা তাই একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

বললাম, সত্যি, এতক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকা ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না।

কৌশানীতে এসে গাড়ি থামল। এ বাস গড়ুর উপত্যকায় নেমে যাবে। আমরা কৌশানীতেই নামলাম। কৌশানী ডাকবাংলো একটা পাহাড়ের ওপর।

উঠতি পথের বাঁয়ে একটি ছোট্ট চায়ের দোকান। তার পাশেই বাসের টিকিট ঘর।

দাদা পান খাবেন? অহল্যা চেঁচিয়ে উঠল।

আমরা সবাই ফিরে তাকালাম তার দিকে। ততক্ষণে অহল্যা কিছুটা ওপরে উঠে গিয়ে একটি প্রায় গিরিগুহার সামনে এক পানওয়ালাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে।

সবাই উঠে গেলাম। শিল্পী বললেন, শীতের পক্ষে পানটা বিশেষ উপযোগী।

বললাম, শীত গ্রীষ্ম সর্ব ঋতুতেই এর সমান কদর।

পান খাওয়ার পর খাড়াই পাহাড় ধরে আমরা উঠে চললাম ওপরে।

অহল্যার হাঁপ ধরেছে। সবার পেছনে সে আসছিল। হঠাৎ আমার কোটের পেছনে টান পড়তেই ফিরে চাইলাম। অহল্যা এবার আমার হাত ধরে ফেলল।

পারছি না দাদা এমন একটানা উঠতে, একটু সাহায্য চাইছি তাই—হাসছিল অহল্যা।

বললাম, হার মানলে বল, তারপর সাহায্য দেবার কথা বিবেচনা করা যাবে।

হাত ছেড়ে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল অহল্যা। হার মানব না আমি। আপনারা যান, একটু পরেই ঠিক আমি পৌঁছব।

হেসে হাত ধরে তুললাম, ওঠ, ওঠ, অযাচিত সাহায্য করছি ভেবে হাতটা না হয় ধরেই চল এবার।

এসে পৌঁছলাম ডাক বাংলোয়। পাশাপাশি দুটি বাংলো রয়েছে। খানসামা হবিব মিঃ অরোরার বহুদিনের চেনা। হবিবের ছেলে এগিয়ে এসে মিঃ অরোরার হাতব্যাগটা ধরে নিলে। অরোরা আমাদের বেডিং-এর খোঁজ নিলেন ছেলেটির কাছে। আমরা সবাই ডাক বাংলোয় উঠে বসলাম।

একটু পরেই হবিব এল। শীর্ণদেহী একটি ছোটখাট মানুষ। চোখে চাঁদির চশমা, মুখে সংযত হাসি। হবিবকে দেখে একেবারেই খানসামা বলে মনে হল না। তার বেশবাসের দারিদ্র্য-দশার মাঝেও সমস্ত অবয়বে একটা সম্ভ্রম জড়ানো ছিল।

দেখা সাক্ষাতের পর হবিব চলল খাবারের আয়োজন করতে। ডাক বাংলোর একটু নীচেই ওর ঘর। সেখানে স্ত্রী, ছেলেপুলে আর দু-চারটে মোরগ নিয়ে ও সংসার পেতেছে।

খাওয়া-দাওয়া সারা হল। খিঁচুড়ি আলুভাজা আর অমলেট। অহল্যার অমলেট বাদ গেল। বললাম, নিরামিষাশী হলেই এমনি ঠকতে হয়।

অহল্যা বলল, ঠিক আছে, জল খাবারের সব আয়োজন আমার হাতে। তখন দেখা যাবে কে ঠকে আর কে-ই বা জেতে।

খাওয়া শেষ হল, কিন্তু মনটা বড় ভারী হয়ে উঠল। কারণ কৌশানীতে আসা শুধু তুষারশৈল দেখার আগ্রহে। নৈনীতালের চায়না পিক অথবা রাণীক্ষেত থেকে দীর্ঘ হিমাচলের দৃশ্য দেখা যায়,

কিন্তু কৌশানী থেকে ত্রিশূল নন্দাদেবী নন্দাকোড শৃঙ্গগুলি এত কাছে যে মনে হবে তাদের হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। কিন্তু স্পর্শ করা তো দূরের কথা—মেঘের গুণ্ঠনে এমনি ঢাকা পড়েছে শৈলশৃঙ্গগুলি যে তাদের রূপের সামান্যতম অংশও আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ল না।

সারাদিন মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ালাম পাহাড়ে পাহাড়ে, চীর আর দেওদার বনে। দূরের পাহাড়ের ওপর জলভরা একটি মেঘ দেখলাম। আসন্ন ঝড়ের সংকেত পেয়ে পাহাড়ের ওপরে গাছগুলো তাদের পত্রশীর্ষ আন্দোলন করতে লাগল। মনে হল যেন মাটির বন্ধন ছিন্ন করে মেঘলোকে যাত্রার জন্য তাদের এই উদ্দাম আন্দোলন। শিল্পী পর্বতশীর্ষে মেঘের একটি মনোরম ছবি তুলে নিলেন।

বললাম, ছবি ছাপা হলে তার তলায় ক'টি লাইন বসিয়ে দিতে হবে।

এমন লাগসই কিছু মিলেছে নাকি? শিল্পী প্রশ্ন করলেন।

বলাকা থেকে একটি ছত্র উদ্ধৃত করলাম,—

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ঐ শব্দ রেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।'

সত্যি লাইনগুলো যে দেখছি আমার ছবিকেও ছাপিয়ে গেল, শিল্পী অবাক হয়ে বললেন।

বললাম, এ ছত্র যাঁর তিনি যে সব রূপের ওপরেই তাঁর অপরূপ কথার তুলি চালিয়ে গেছেন, সেখানে হার মানলে অগৌরবের কিছু তো নেই দাদা।

শিল্পী বললেন, তাঁর কাছে হার মানাই আমাদের গৌরব।

আমরা বাংলোর দিকে উঠছি, এমন সময় মুখ তুলতেই দেখলাম মিঃ অরোরা আর অহল্যা নেমে আসছে।

চলুন—চলুন—চলুন সব, নীচেই নেমে চলুন, খুব জবর একটা খবর পাওয়া গেছে—পারলে অহল্যা যেন আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়।

বললাম, কি এমন তোমার খবর?

মিঃ অরোরা জবাব দিলেন, শুনলাম নীচে এক সাধু এসেছেন, তিনি নাকি রামায়ণ গান করছেন।

সবাই মিলে নীচে নেমে চললাম। অহল্যাকে দুষ্টুমিতে পেয়ে বসল। আমার হাত ধরে সে টানতে লাগল। আসুন দাদা, আপনাকে নামতে সাহায্য করা যাক।

হেসে বললাম, এ আবার কি ছেলেমানুষী।

বাঃ, আসার সময় আপনার হাত ধরে ওপরে উঠলাম, তাই এখন নামার পথে আপনাকে শোধ দিচ্ছি। জানেন তো ঋণী থাকার বিপদ?

প্রাণলীলায় চঞ্চল মেয়েটি এ ক'দিনেই আমাদের মনের সব কটি রুদ্ধ দ্বার যেন ঝড়ের ঝাপটায় খুলে দিয়েছে। সমস্ত অন্তরটা স্নিগ্ধতায় আর উদ্বেলতায় ভরে গেছে।

এসে পৌঁছলাম পাহাড়ের পাদদেশে। বাসের টিকিট-ঘরের নীচে দেখলাম আসর বসেছে। একটি হেরিকেনের মৃদু আলোর সামনে কথক বসে কথকতা করছেন। কয়েকটি পাহাড়ী তাঁকে ঘিরে রয়েছে। আমরা যেতেই পাশের দোকানের মালিক একটি বেঞ্চ পেতে দিল। আমরা বেঞ্চে না বসে ঐ পাহাড়ী লোকগুলির মাঝে গিয়েই বসলাম।

গান শুরু হয়েছে অনেক আগেই। আমরা যখন আসরে বসলাম তখন সুরধুনীর কূলে এসে পৌঁছেছেন শ্রীরামচন্দ্র, সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ আর সীতাদেবী। তদগত কথক বলে চলেছেন,—

মাঝি, মাঝি ডাক দিতেই পারাণী নৌকোটি নিয়ে মাঝি এসে হাজির হল এ পারে।

পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে মাঝি চিনতে পারল, ইনি নররূপে স্বয়ং নারায়ণ। আজ কি সৌভাগ্য তার। তবে সুযোগ যখন সে একবার পেয়েছে—তখন সহজে সে তা হারাবে না। শ্রীরামচন্দ্রকে পার করতে গিয়ে মাঝি একটু ছলনার আশ্রয় নিল। কপট অসম্মতি জানিয়ে বলল,

ইয়ে শুনাহে ম্যায় নে জাদু হ্যায়
রাজাজীকে পদপঙ্কজ মে
পাত্থর মে জান ডালনে কি হ্যায়
শক্তি মহান চরণ রজমে—

পাথরে চরণধূলি পড়লেই নাকি তাতে প্রাণ জেগে ওঠে, তাহলে এ বিপদের ঝুকি নেয়া যায় কেমন করে। অতএব যদি একান্তই পার করতে হয় তাহলে আগে চরণদুটি ধুইয়ে না নিয়ে সে কিছুতেই শ্রীরামকে নৌকায় তুলতে পারবে না।

নহীঁ যবতক চরণ লুঁ পাখার
চঢ়াউ না রাজা

ভগবান রামচন্দ্র তখন মাঝির কথা শুনে বললেন, যদি এমনি করলে তোমার মনের বিকার ঘোচে তাহলে তাই কর। শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা পেয়ে মাঝির তখন আর আনন্দ ধরে না। প্রেমিক পেয়েছে প্রেমের ঠাকুরের দর্শন। সহজে কি তাঁকে ছেড়ে দেয়া যায়। তাই মাঝি পতিতপাবনের চরণ ধুইয়ে দিতে লাগল।

এবার কথক ঠাকুর এর ওপর নিজের মন্তব্য জুড়ে দিলেন,

—উন চরণুকা মল ক্যায়া ধোয়া
ধোয়া সেবক নে মল আপনা—

মাঝি রামচন্দ্রের চরণ ধোয়ানোর ছলে নিজের মনের ভেতর জমে-ওঠা ময়লাই পরিষ্কার করে নিল। এমনি করে ধন্য হয়ে গেল তার জন্ম জন্মান্তর।

তারপর শ্রীরাম, লক্ষ্মণ আর সীতাদেবীকে নিয়ে নৌকো ও পারে

গিয়ে ভিড়ল। একে-একে তাঁরা তিন জনে নৌকো থেকে কূলে নামলেন।

কিন্তু পারানি কড়ি কই! রাজপুত্র হয়েও প্রভু রামচন্দ্র আজ ভিখিরী। সামান্য পারের কড়ি দেবার সামর্থ্য আর্জ আর তাঁর নেই। নিঃস্ব রামচন্দ্র অসহায়ের মত শুধু তাকিয়ে রইলেন সুরধুনীর জলের দিকে।

স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন সঙ্কুচিত হয়ে, তাই দেবী জানকী বিচলিত হলেন। পতিকে বিমর্ষ দেখলে কোন সাধ্বী রমণী বা স্থির থাকতে পারেন। তাই,

আপনে স্বামীকি সকুচাহট
জীস সময় নিহারী সীতানে
অঙ্গুলি সে আপনি মণি মুন্দরি
উস সময় উতারি সীতানে।

সীতা নিজের অঙ্গুলি থেকে অঙ্গুরীয় খুলে স্বামীর হাতে দিয়ে দিলেন।

এতক্ষণে চিন্তামুক্ত হলেন চিন্তামণি। তিনি সীতার হাত থেকে সোণার অঙ্গুরীয় নিয়ে মাঝিকে পারানি দিতে গেলেন। তখন চতুর মাঝি বৈঠার ঘায় নৌকোটিকে কূল থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বলল, দেখ ঠাকুর আমরা দু জনে হচ্ছি জাতভাই।

মে গঙ্গা ঘাটকা মাঝি হুঁ
তুম ভবসাগরকে কেয়ট হো
মে ইস ধারাকে তীর পেহুঁ
অর তুম উস দরিয়াকে তট হো।

আমি এ পারে যেমন গঙ্গা ঘাটের মাঝি, তেমনি তুমিও ও পারে ভবসাগরের মাঝি। এখন তবে বল তো মহাজন, জাতভায়ের কাছে জাতভাই কি পয়সা দিয়ে বিনিময় করে?

এক মজুর কি অন্য মজুরকে পয়সাতে মজুরি শোধ দেয়? মাঝি কি মাঝিকে পয়সা নিয়ে পার করে?

মজদুর কঁহি মজদুরোঁকো
মজদুরী দেতে হেঁ ভাইয়া ?
মল্লাহ কঁহি মল্লাহুঁসে
মল্লাহি লেতে হেঁ ভাইয়া ?

তবে কেমন করে পরস্পরে ঋণের শোধ দেবে ? কেউ তো কারো কাছে চিরদিনের ঋণী হয়ে রইবে না।

আপনে কো ঋণী সমঝতে হো
তো ঋণ তুম ওঁহি চুকা দেনা
মেনে ইঁহা তুমকো পার কিয়া
তুম মুঝকো ওঁহি পার লাগা দে না।

চতুর মাঝি তাই পতিতপাবন ভগবানকে কাছে পেয়ে বলল, যদি নিজেকে তুমি একেবারে ঋণীই ভেবে থাক তাহলে সোণার অঙ্গুরীয়তে আর ঋণ শোধ দিয়ে কাজ নেই। আমি এখানে তোমাকে পার করে দিলাম, ভবের খেলা শেষ করে যখন ও পারে যাবার জন্যে ভবসাগরের কূলে গিয়ে দাঁড়াব তখন তুমি আমায় তোমার নৌকোয় ও পারে পৌঁছে দিও। তাহলেই তোমার ঋণ শোধ হয়ে যাবে। থামলেন কথক ঠাকুর। বোধহয় তাঁর পালা আপাতত এখানেই শেষ হল। পাহাড়ীরা একে একে উঠে তাঁকে নত হয়ে নমস্কার জানাতে লাগল। আমরা উঠে এলাম আসর ছেড়ে। হবিব ইতিমধ্যে একটি হেরিকেন লণ্ঠন নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সে আগে আগে পথ দেখিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল, আমরা উঠতে লাগলাম তার পেছন-পেছন।

ঘন অন্ধকার। মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের চমক আর দমকা বাতাসের ঢেউ। আকাশের কোন এক প্রান্ত থেকে মেঘের চাপা গর্জন ভেসে আসছে। সৃষ্টিনাশা তাণ্ডবের গোপন ষড়যন্ত্র চলেছে কোথায়। সবকিছু ছাপিয়ে শুধু একটি কথা বার বার মনের মন্দিরে প্রতিধ্বনি তুলছে, তুম মুঝকো পার লাগা দে না, তুম মুঝকো পার লাগা দে না।

রাত্তিরে সত্যই ঝড় এল। সমস্ত গগন পূর্ণ করে পুঞ্জ-পুঞ্জ রূপে ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বেঁধে যেন কোন উন্মাদিনীর নৃত্য শুরু হল। হিমাচল থেকে ঝলকে ঝলকে বাতাস বয়ে আসছে, যেন শীতের শায়ক। বাইরে দেহ বের করবার উপায় নেই, তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হতে হবে। মেঘের গুরু গুরু, চীর পাইনের বনে বনে শাখা-প্রশাখায় উদ্‌ভ্রান্ত পলায়নের দৃশ্য।

সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরের ভেতর শিল্পী আর আমি বসেছি। পাশের বাংলোতে রয়েছে অহল্যা আর তার মামা। আজ সারা রাত্রি ঝড়ের সঙ্গে আমরাও জাগব, শিল্পীর সঙ্গে এই কথা হয়েছে। এখানে এসে তুষার দেখা যদি ভাগ্যে না থাকে তাহলে অন্তত ঝড়ের রাতে যাঁর অভিসার হবে তাঁকে নিদ্রাহীন নয়নে দেখে নিতে হবে। মনের কপাটটি খুলে রাখতে হবে, নইলে দুঃখ রাতের রাজা হয়তো দ্বারে ঘা দিয়েই ফিরে যাবেন নীরব অভিমানে।

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।

নির্বাণ দীপ নির্জন ঘর গানে গানে ভরে উঠেছে। কথা আর সুর দোসর হয়ে তালে-তালে ছন্দে-ছন্দে চরণ মিলিয়ে চলেছে। যেখানে সুর ভেঙে যাচ্ছে সেখানে কথা যাচ্ছে এগিয়ে। আজ বাইরের শ্রোতার কাছে আগল দিয়ে শুধু বসেছি মনের মুখোমুখি। সেখানে একেলা গায়ক, একেলা শ্রোতা। মনে মনে মনের কথা শোনা, মনে-মনে সুরের জাল বোনা।

বাইরে করাঘাত পড়ল। দুয়ার খুলে দিলাম। দুঃখরাতের রাজা নয়, এসেছে বিজয়িনী অহল্যা। ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ও বাংলো থেকে এসেছে আমাদের বাংলোয়।

ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে প্রায় ফেটে পড়ল অহল্যা, বলি ও বাড়ি থেকে যে এতক্ষণ ধরে চেঁচাচ্ছি, কানের ভেতর সব তুলো দিয়ে বসে আছেন নাকি?

বললাম, তুলো দেবার দরকার কি, ঝড়েতে অনেক আগেই কানে তালা লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

শিল্পী বললেন, আগে তোমার বক্তব্য পেশ কর, তারপর তার গুরুত্ব বুঝে আমাদের অপরাধের পরিমাপ করা যাবে।

অহল্যা বলল, সেই সন্ধ্যে থেকে আপনারা ঢুকলেন এ ঘরে, আর একলা আমাকে পেয়ে মামা একেবারে কুরুক্ষেত্র রণভূমিতে টেনে নিয়ে হাজির করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে জ্ঞানহারা হবার জোগাড়, তাই সেই রূপদর্শনের জন্যে আপনাদের ডাক দিচ্ছিলাম।

বললাম, অবস্থা গুরুতর সন্দেহ নেই।

শিল্পী বললেন, ক্লীবত্ব ত্যাগ করে লক্ষ্মী মেয়ের মত গীতার বাণী শোন গে যাও। পলায়ন করে আর নারীত্বের অবমাননা করো না।

অহল্যা হতাশায় ভেঙে পড়ল, তাহলে সত্যিই যাবেন না?

বললাম, আর যেখানেই যাই, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যাত্রা একেবারে অসম্ভব।

তবে আমিও এখানেই বসলুম, মামা একা একাই গীতা পাঠ করুন—বসে পড়ল অহল্যা খাটের ওপর।

অহল্যাকে গান গাইতে অনুরোধ করলাম। এবারে সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ঠিক পথ বাতলেছেন দাদা। আমার গান যদি একবার আপনাদের শোনাতে পারি তাহলেই প্রাণ নিয়ে এ ঘর ছেড়ে পালাবার পথ পাবেন না। তখন কুরুক্ষেত্রে যেতে আর একটুও আপত্তি থাকবে না।

শেষে অনেক অনুরোধে অহল্যা একটি মীরার ভজন গাইল। গান শেষ হলে দেখলাম গলা সম্বন্ধে অহল্যা যেরূপ শঙ্কিত করে তুলেছিল তা মোটেই নয়। সুরের মধু ঝরে না পড়লেও অন্তত অসুরের আবির্ভাব ঘটেনি।

আবার দরজায় করাঘাত। মিঃ অরোরা এলেন নাকি। দ্বার

খুলে দেখি হরিব খাবার ডিস নিয়ে এসেছে। অহল্যা বলল, ও ঘরে মামাকে খাবার দিয়ে এস, আমায় এখানেই দাও।

বললাম, মুর্গীর দুঃখ সইতে পারবে?

হেসে বলল, কুরুক্ষেত্রের এতগুলি অক্ষৌহিণী বধের দৃশ্য দেখার চেয়ে এই সামান্য পক্ষীর বিয়োগদুঃখ আশা করি সইতে পারব।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে, গল্প-গুজব সেরে যখন অহল্যাকে পাশের বাংলোতে পৌঁছে দিতে গেলাম তখন দেখি অরোরা শয্যা নিয়েছেন। বাইরে থেকেই ঘরের ভেতর পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শুনতে পেলাম। ফিরে এসে ঘরে দোর দিলাম। ঘড়িতে তখন রাত একটা।

চিড়-চিড় শব্দে কাঠ পুড়ছে ফায়ার প্লেসে। আমরা আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় চেয়ারে আশ্রয় নিলাম। ক্লান্তি এসেছিল, কারণ একটু আগেই অতিভাষণ হয়ে গেছে।

শিল্পীকে বললাম, আজও কি 'নিদ নাহি আঁখি পাতে?'

কেন, নিশি জাগরণের প্রস্তাবটা আমি দিয়েছিলাম নাকি? শিল্পী পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

হার স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আঁখি একেবারে নিদ্রায় জড়িয়ে আসছে। কখন চুপি পদসঞ্চারে এলেন পদ্মনাভ টেরও পেলাম না।

তখনও প্রভাত হয়নি, আকাশে বোধকরি শুকতারাটি শ্যামলা মেয়ের গালের ওপর পড়ে থাকা কর্ণভূষার হীরের মত জ্বল জ্বল করছে, শিল্পীর ডাকে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

দাঁড়িয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। নির্মেঘ আকাশ, বহু নিম্নে কুয়াশার আস্তরণে-ঢাকা উপত্যকা; তার ওপরে সুস্পষ্ট জেগে আছে তুষারমৌলী হিমাচল। এত কাছে আর এত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যেন মনে হয় হাত বাড়ালেই তুষারস্তূপকে স্পর্শ করা যায়।

অমরাবতীতে ভোরের ছোঁয়া লাগল। পারদবর্ণের হিমানী-স্তূপ ধীরে ধীরে উজ্জ্বল থেকে আরো উজ্জ্বল হয়ে চলেছে। ত্রিশূল শৃঙ্গের পাশে নন্দাদেবী, তার পাশে ঐ তো নন্দাকোট, পঞ্চচুলি। এ দিকে চৌখাম্বা, গাড়োয়াল শৃঙ্গরাজি।

পেছনে অরণ্যের অন্তরালে সবিতার আবির্ভাব হয়েছে। ঐ যে নন্দাদেবীর শুভ্র ললাট সিন্দুর রঞ্জিত হল। দেখতে দেখতে ত্রিশূলে এসে লাগল সেই রঙের ছোঁয়া। মনে হল প্রণতা নন্দাদেবীর ললাটের সিন্দূর এসে লেগেছে ত্রিশূলশৈলে। এবার একে-একে জ্বলে উঠল নন্দাকোট, চৌখাম্বা, পঞ্চচুলি। সুরলোকে যেন প্রভাতের আরত্রিক লীলা চলেছে। আবার এক সময় স্থির হয়ে এল বর্ণলীলা। এখন মনে হচ্ছে স্বর্ণবর্ণের তুষার কণা ঝরে-ঝরে পড়ে যাচ্ছে শৈলশৃঙ্গগুলির গা বেয়ে।

মুগ্ধনেত্রে নির্বাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইলাম সেই দিকে।

মুগ্ধ শিল্পী কথা বললেন, এমন একটি প্রসন্ন প্রভাতের কামনা করেছিলাম আমরা এতকাল ধরে, তাই না?

কাল রজনীর ঝড়ের মাঝে যাঁর ভয়ের রূপ দেখেছিলাম, সেই জীবনের লীলাকার তাঁর ভয়ের সাজটি খুলে ফেলে আজ প্রভাতের হিমাচলের স্বর্ণ সিংহাসনে বসেছেন।

পাশে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন মিঃ অরোরা আর অহল্যা। আমরা ফিরে চাইলাম। তাঁদের চোখে মুখেও রূপের আনন্দ খেলে যাচ্ছে। মিঃ অরোরা বললেন, কেন আমি ব্যবসায়ী হয়েও পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই তা এখন বুঝতে পারছেন নিশ্চয়। মনে মনে বললাম, এই অরণ্যভূমি, পার্বত্য নির্ঝরিণী, শিশুর মত সরল পর্বতবাসী আর সবার ওপরে এই হিমাচল—এর পরেও মানুষের অন্য আকর্ষণ যেন কল্পনাতীত বলে মনে হয়। ভিখিরীর মত যে মন নগরীর পথে-পথে ক্লিষ্ট হয়, সেই মন এখানে এসে সত্যই রাজার ঐশ্বর্য কুড়িয়ে পেল। এখন সে মহারাজ, পার্থিব কোন ঐশ্বর্যই আর তার কাছে বৃহত্তর প্রলোভন নিয়ে আসতে পারবে না।

সমস্ত প্রভাতকালটি আমাদের মন সেই রূপের আনন্দে পূর্ণ হয়ে রইল। ধীরে ধীরে সূর্যের আলো তীব্র হতে লাগল আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটি দৃশ্য চোখে পড়ল। উপত্যকায় যেসকল মেঘ রাতের বিশ্রাম নিচ্ছিল এখন তারা সূর্যের উষ্ণ রশ্মির ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে মেঘরাজি শৈলগাত্রে সংলগ্ন হয়ে স্থির হয়ে রইল। এখন তুষারমৌলী আর দেখা যায় না, শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের পাহাড়ে সমস্ত হিমাচল আচ্ছন্ন।

দুপুরের দিকে আবার মেঘসজ্জা। শৈলসংলগ্ন মেঘেরা এখন সজ্ঘবদ্ধ হয়ে দক্ষিণ মুখে তাদের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সাঁঝে ঝড় উঠতে পারে তাই দুপুরেই চললাম সরলা বহিনের আশ্রমে। শিল্পী আর মিঃ অরোরা গেলেন অল্প দূরে এক চাষের বাগানে। অহল্যা কোন দলেই গেল না। সামান্য অসুস্থতার অজুহাতে সে একা একা দুপুরটা বাংলোতেই থেকে গেল।

বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে নেমে গিয়ে সামনে আর একটি পাহাড় ধরে উঠতে লাগলাম। বেশ কিছু পথ উঠে গিয়ে আর পথ পাই না। মহা মুস্কিল, এখন কি করা যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এ দিক ও দিক তাকাতে লাগলাম। পাঁচ সাত মিনিট পরে ওপরের পথে দেখা গেল একটি আট-দশ বছরের পাহাড়ী মেয়েকে। সে একটি গরু তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল। ইশারায় তাকে ডাক দিলাম। মেয়েটি কাছে এল। বললাম, সরলা বহিনের আশ্রম কোন্ পথে বলতে পার? মেয়েটি জানাল, সে সরলা বহিনের আশ্রমেই থাকে। শুনে তার সঙ্গেই চললাম। আশ্রমে ঢুকতে যাচ্ছি দেখে একটি সারমেয় অভ্যর্থনা জানাল। দেখলাম স্থানমাহাত্ম্যে সারমেয়টিও অহিংস হয়ে পড়েছে। অন্তত তার আচরণে তাই প্রকাশ পেল।

আশ্রমটির নাম লক্ষ্মী আশ্রম। গান্ধীজীর শিষ্যা এক ইউরোপীয় মহিলা এই নির্জন স্থানে আশ্রমটি স্থাপন করেছেন। ইনিই সরলা বহিন।

শুনেছি প্রথমে ইনি শবরমতী আশ্রমে ছিলেন। পরে এই মনোরম স্থানে নিজের চেষ্টায় পাহাড়ীদের সাহায্যে এই আশ্রমটি গড়ে তুলেছেন।

সরলা বহিন সে দিন আলমোড়ায় গিয়েছিলেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। অন্য একটি মেয়ে এগিয়ে এসে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। অসংকোচ অমায়িক ব্যবহার। মেয়েটি সদ্য নার্সিং পাশ করে এসেছেন এখানে। বয়স অল্প কিন্তু প্রতিটি কথায় তাঁর সংযম আর কর্মে উদ্দীপনা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলাম। তিনি আমাকে আশ্রমের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলেন। ছোট ছোট পাহাড়ী মেয়েদের এখানে এনে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হয়। কাপড় বোনা, চাষের কাজ, পশুপালন, গৃহচিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়গুলি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া সাধারণভাবে লেখাপড়া শেখানো ও ধর্মপুস্তক থেকে পাঠ করে বোঝানো হয়। নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় চিত্তকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য প্রার্থনারও ব্যবস্থা আছে।

দেখলাম কয়েকটি মেয়ে সামনের ফুলের বাগানে কাজ করছে। নতুন অতিথির আগমনে তাদের ভেতর চাঞ্চল্য দেখা গেল। পেছনে ফিরে বার বার আমার দিকে তাকাতে লাগল। দৃশ্যটি বড় ভাল লাগছিল। শিশুমনের শিশুসুলভ কৌতূহল। চারিদিক ঘুরে শেষে বিদায় নিয়ে চললাম। মন ভরে গেল। ছোট্ট একটি নিরালা সাধনপীঠ। কত দূর দেশ থেকে, বিলাসিতার সহস্র আধুনিক উপকরণের প্রলোভন ছেড়ে শুধু অন্তরের তাগিদে মানুষ চলে আসে এমন নির্জন স্থানে। শুধু মানুষের ভালবাসা পাথেয়। সেবাই একমাত্র সম্বল। এমনি করে একদিন ভগিনী নিবেদিতাও মানুষের প্রেমে পাগল হয়েছিলেন। অপরিচিতা সরলা বহিনকে মনে মনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালাম।

সরলা বহিনের আশ্রম থেকে ফিরে এলাম। ঝড়ো হাওয়ার মাতন শুরু হয়েছে। উতলধারা বাদল ঝরার যা বাকী। পাহাড়ের ওপর চীরপাইনের মাথাগুলো লুটোপুটি খাচ্ছে। দেখতে দেখতে

অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। পূবের দিকে একফালি উজ্জ্বল আকাশের প্রান্ত তখনও নীল আলো ছড়াচ্ছিল। পাহাড়ের ওপর বাংলো নিশানা করে উঠে আসতে লাগলাম। কাছাকাছি হতেই দেখলাম বাংলোর ধারে চীরগাছের নীচে একটি ভগ্নশিলায় চুপচাপ বসে আছে অহল্যা।

কি করছে অহল্যা এমন ঝড়ের মুখোমুখি! পেছন থেকে ডাক দিলাম। শুনতে পেল না; আবার ডাকলাম। প্রায় চমকে ফিরে দাঁড়াল অহল্যা। ততক্ষণে আমি তার সামনে এসে গেছি। চোখে জল! আমার দিকে তাকিয়ে কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল সে। বলল, কোথায় ছিলেন দাদা?

বললাম, তার আগে বল দেখি তুমি এই ঝড়ের ভেতর এখানে বসে কি করছ?

দেখলাম অহল্যার মুখ মুহূর্তে ভারী হয়ে এল।

কি হয়েছে অহল্যা? সস্নেহে শুধোলাম।

আকাশের বুকের সবখানি ঝড় যেন নিমেষে ভেঙে পড়ল অহল্যার ওপর। স্নেহের স্পর্শ পেয়ে প্রায় লুটিয়ে পড়ল সে শিলা-খণ্ডের পাশে। বিস্ময় বিভ্রান্তিতে একেবারে হতচকিত হয়ে গেলাম। এমন চপলা সদানন্দময়ী মেয়েটির এ রূপ যে একেবারে কল্পনার অতীত ছিল। পাশে গিয়ে সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, অহল্যা, তুমি আমাকে দাদা বলে ডেকেছ, আমার অন্তরের সবটুকু স্নেহ তোমাকে আমি উজাড় করে দিয়েছি, তোমার দুঃখের কারণটুকু শোনবার অধিকার কি আমার নেই?

অহল্যা কিছু আত্মস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, কিছু মনে করবেন না, আমি একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। আসুন আমরা বাংলোয় উঠে বসি।

অহল্যার সঙ্গে সঙ্গে বাংলোয় গিয়ে উঠলাম। পশ্চিমের বাংলোয় শিল্পী আর মিঃ অরোরা আসর জমিয়েছেন। মাঝে মাঝে হাসির শব্দ এ পারের বাংলো অবধি এসে পৌঁছচ্ছিল। অহল্যা

ঘরের ভেতর গিয়ে একটি হেরিকেন জ্বালল। তারপর জ্যোতিটুকু প্রায় স্তিমিত করে সেটিকে দরজার ভেতরে রেখে বাইরের দাওয়ায় এল। আমি ততক্ষণে একটি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছিলাম, অহল্যা এসে আমার পাশে আর-একটি চেয়ারে বসল। দূরে হিমাচলের তুষারমৌলী আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, নীচে বহু দূর বিস্তৃত তমসাবৃত গড়ুর উপত্যকা, আর আমাদের বাংলোর চারিদিকের অরণ্যে ঝড়ের তাণ্ডব মাতন।

অহল্যা ধীরে ধীরে কথা বলল, পরিচয় আপনার সঙ্গে আমার ক'দিনেরই বা তবু একান্ত আপনজনের অধিকার আপনি আমায় দিয়েছেন।

হেসে বললাম, তা তো মনে হচ্ছে না, নইলে দাদার কাছে নিজেকে এমনি করে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?

নিজের কাছ থেকে পালাবার জন্যে যখন যুদ্ধ করছিলাম, তখনি আপনার সঙ্গে আমার মুখোমুখি হল, বললে অহল্যা কতকটা আত্মস্থ অবস্থায়।

অহল্যা নিজের কাছ থেকে পালাতে চায় কেন? মনে কৌতূহল জেগে উঠল। কিন্তু কোন কিছু প্রশ্ন করা অসমীচীন মনে করে চুপচাপ বসে রইলাম।

অহল্যাই খানিক পরে কথা শুরু করল, আচ্ছা দাদা, পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই?

বললাম, অনুতাপেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। কিন্তু সে না হয় হল, তুমি যে বড় বেশী হেঁয়ালী শুরু করলে দাদার সঙ্গে।

অহল্যা বলল, মানুষ মনের দুঃখকে বইবার জন্যে দোসর চায়। ব্যথা-বেদনা অন্যের কাছে বলে সে নিজেকে হাল্‌কা করতে চায়, তাই না?

বললাম, এই তো মানবমনের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি।

অহল্যা বলতে শুরু করল, আমাকে প্রগল্‌ভা ভাববেন না,

আপনি জানতে না চাইলে আমার মনের বেদনা মনেই থেকে যেত। আপনার কাছ থেকে স্নেহসান্ত্বনা পেয়ে আমার সাহস বেড়ে গেছে।

রহস্য করে বললাম, তোমার সাহস দীর্ঘজীবী হোক।

অহল্যা ততক্ষণে মনে মনে প্রস্তুত করে নিয়েছে নিজেকে। সঙ্কোচ সরিয়ে সে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, কৌশানীতে কয়েক বছর আগে আমার জীবনে এক অভাবিত মুহূর্ত এসেছিল, জীবনে সেই প্রথম পুষ্পধন্বুর প্রসাদলাভ।

আমি আর মামা ছিলাম এই বাংলোতে আর ও পারের বাংলোতে এসে উঠেছিল দুটি ভ্রাম্যমান যুবক। প্রথম দিনে কোনো কথা হয়নি তাদের সঙ্গে। এদিক ওদিক যাওয়া-আসার পথে শুধু চোখে পড়েছে তাদের দু-চার বার। তাদের দুটিই সুন্দর দেহী, কিন্তু একটি সুদর্শন অন্যটিকে কোনোমতেই সুন্দর বলা যায় না। কথার মাঝেই হাসল অহল্যা; আপনি বুঝি হাসছেন আমি আগেই রূপ বিচার করছি দেখে।

বললাম, এ তো কেবল তুমিই করছ না, পণ্ডিতদেরও যে সেই একই কথা, আগে রূপের বিচার তারপর গুণের।

অহল্যা বলল, তবে দাদা বলে রাখি, রূপহীন ছেলেটির হাসিটুকু বড় মধুর ছিল।

বললাম, তারপর?

অহল্যা বলতে লাগল, প্রথমে মামার সঙ্গে সামান্য কথার ভেতর দিয়ে আলাপ হল, তারপর আমাদের বাংলোতে রইল তাদের চায়ের নেমন্তন্ন। সেখানে আমিও পরিচিত হলাম। দু বন্ধুই দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন কলেজের ছাত্র; ছুটির অবকাশে যাযাবর বৃত্তিটা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

মামা ছেলেদুটিকে উৎসাহ দিলেন। নিজের ভ্রাম্যমান জীবনের অনেক কাহিনী শোনালেন। দু-এক দিনেই আমাদের আসর জমে উঠল।

খানিক থামল অহল্যা। এবার গলায় তার সলজ্জ সুর, যে

ছেলেটির সঙ্গে আমার মনের বিনিময় হল তার নাম রাজা। অন্য বন্ধুটির নাম হল অশোক। রাজার মুখেই শুনেছিলাম, বারোয়ারী পুজো থেকে শবদাহ অবধি এমন কোনো কাজ নেই যেখানে অশোক অনুপস্থিত। তাছাড়া হেন অসাধ্য কাজ নেই যা সে নাকি বন্ধুদের জন্যে করতে পারত না। অশোক সুন্দর ছিল না কিন্তু তার স্বভাবটা আমাদের বড় বেশী মুগ্ধ করেছিল।

আপনি দেখছেন দাদা মেলামেশার ব্যাপারে মামা বড় বেশী উদারপন্থী। আমরা তাই কৌশানীর পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রাজা বলত, তুমি খুশির ঝর্ণাধারা, আমার তপ্ত মনটাকে স্নান করিয়ে দিলে। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকাতাম রাজার দিকে। ঐ যে শিলাস্তূপ দেখলেন, ওখানে বসে শুধু চোখে চোখ রেখে কত মধুর মুহূর্ত আমরা কাটিয়ে দিয়েছি। বন্ধুবৎসল অশোক ও দিকে মামার সঙ্গে গল্প জমিয়ে আমাদের আনন্দের ক্ষণগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করে দিত।

হেসে বললাম, দুষ্টের দেখছি ছলের অভাব হয় না।

অহল্যা বলল, অপবাদ যদি দেন তাহলে আর কাহিনী এক পাও এগুবে না।

বললাম, ছলনা নইলে ভালবাসার বাকী রইল কি? ওটুকু তো অপরিহার্য।

অহল্যা বলে চলল, এর পরের অধ্যায়ে আমাদের পিণ্ডারী গ্লাসিয়ারে যাত্রা। চায়ের আসরে মামাই তাঁর পিণ্ডারী গ্লাসিয়ার ভ্রমণের কথাটা তুলেছিলেন। অশোক টগবগ করে বলল, সে এ যাত্রায় অবশ্যই পিণ্ডারী হিমবাহের দিকে পাড়ি দেবে। মামা উৎসাহ দিলেন। অশোক, রাজা আর আমার চোখে চোখে কথা হয়ে গেল।

বললাম, আমিও যাব মামা। আশ্চর্য, কোনো বাধাই তিনি আমাকে দিলেন না। শুধু বললেন, মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে হেরে যাক এ আমি চাই না, তবে কিছু দিন আগেই তুমি ইনফ্লুয়েঞ্জা

থেকে উঠেছ, তাই ভাবছি পথের কষ্টটুকু কি তুমি সইতে পারবে মা?

প্রবল উৎসাহে তখন আমার নাচতেই ইচ্ছে করছিল। বললাম, নিশ্চয়, নিশ্চয় পারব মামা, তুমি কিচ্ছু ভেব না। না হলে এখুনি এই নিন্দুকেরা আমায় হেরে যাবার অপবাদ দেবে।

হাসলেন মামা, প্রশান্ত হাসি। বললেন, যদি যেতে চাও কালই বেরিয়ে পড়। তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি কিন্তু এই বাংলোতেই অপেক্ষা করব।

ঝড়ের ভেতরে চা আর সন্ধ্যার জলখাবার নিয়ে এল হবিবের ছোট ছেলেটি।

অহল্যা বলল, নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়ে গেছে দাদা, একটু খেয়ে নিন।

বললাম, খেতে গেলে তোমার কাহিনীতে ছেদ পড়বে যে। তার চেয়ে শোনার পরেই না হয় খাওয়াটা সারা যাবে।

অহল্যা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল, ততক্ষণে অন্তত এটুকুতে চুমুক দিতে থাকুন।

চায়ের কাপটা হাতে নিলাম। দেখলাম অহল্যা কিছু নিলে না। ব্যক্তিগত কাহিনী বলতে গিয়ে অহল্যা মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিল। মনে হল ও বুঝি সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

বললাম, কাহিনী যখন শুরু করেছ তখন শেষ কর অসঙ্কোচে। মানুষের জীবনে যা অনিবার্য তাকে সহজ করে প্রকাশ করতে বাধা কোথায়।

অহল্যা বলতে লাগল, যে দিন ভোরবেলা পিণ্ডারীর পথে রওনা দিলাম সে দিনটি স্মরণীয় হয়ে রইবে। শৈলে শৈলে ঊষার আয়োজন চলেছে; নীচে নামছি, পাখিরা ডেকে উঠল। মনে হল যেন এক বুক মুক্তির পলায়ন।

বাসে গেলাম গড়ুর উপত্যকা। সেখান থেকে বাগেশ্বর। বাক্যের ঈশ্বর তাই বাগেশ্বর। মন্দিরে বিগ্রহকে প্রণাম জানালাম।

পথে চলেছি, সারাক্ষণ রাজার হাতের ভেতর রয়েছে আমার হাত; যেন পরম নির্ভরতায় ও আমায় ধরে রেখেছে।

বাগেশ্বর থেকে এলাম কাপকট, তারপর ন মাইল পথ পেরিয়ে এলাম লোহারক্ষেত। এখানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ডাকবাংলোয় রইলাম তিন জনে। রাত্রি আর প্রভাত আমাদের কাছে তখন একাকার। কথায় কথায় রাত্তির পার হয়ে যেত। সোনার আলো গায়ে মেখে ভোর আসত। কি বার চলেছে, লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজের বান্ধবীরা কি করছে, কাশ্মীর নিয়ে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের মন কষাকষি কত দূর গড়াল, এসব আমাদের চিন্তার রাজ্য ছেড়ে বহু দূরে পালিয়েছে। তখন কেবল আমি, রাজা আর বন্ধু অশোক। এই তিন জনের পৃথিবী। লোহারক্ষেত ছাড়লাম। পাইনের গাছ আর দেখা যায় না। এবার ওক গাছের পাশ কাটিয়ে চলতে লাগলাম। অশোক সারাপথ গল্প বলে চলল। মধ্যযুগের দুর্ধর্ষ নাইটদের বিজয়কাহিনী। শুনতে শুনতে আমরা স্বপ্নের মত পেরিয়ে চললাম পথ। শীত তখন আমাদের কাছে প্রথম প্রেমের কাঁপন বলে মনে হত; সূর্যের আলো যেন আমাদের গায়ে সোনার উত্তরীয় জড়িয়ে দিয়ে যেত।

ঢাকুরী হয়ে খাতিতে এসে পৌঁছলাম। এখানেও একটি ডাকবাংলো রয়েছে। পিণ্ডার নদীর কাকচক্ষু জল বয়ে যাচ্ছে। বাম তীরে ডাকবাংলোয় আস্তানা করে রইলাম। প্রায় সারা পথ অশোক বেডিং বয়ে নিয়ে চলত। মাঝে মাঝে রাজা চেয়ে নিত তার কাছ থেকে। নিতান্ত ক্লান্ত না হলে অশোক কারও ওপর ভার চাপাতে একেবারেই নারাজ। অশোক আমাদের আলাপে একটুও বিঘ্ন ঘটাতে চাইত না। আমাদের এগিয়ে যেতে হত, সে আসত আমাদের পেছনে।

ডাকবাংলোতে পৌঁছে অশোক বলত, এবার রান্নার কাজটুকু তুমিই কর আর রাজা করুক শয্যার ব্যবস্থা।

আমরা যখন পথ চলতাম তখন প্রায় সারাক্ষণই উদার বন্ধু-বৎসল অশোকের কথাই বলতাম।

খাতির পর গাছপালার পরিবর্তন হল। এখন শুধু দেওদার। দেওদারের তলায় আমি আর রাজা দাঁড়াতাম। বাতাস বইত, খসে পড়ত গাছের পাতা। অশোক ছবি তুলত আমাদের। খাতি থেকে সাত মাইল পেরিয়ে এলাম ঢুলি, তারপর পাঁচ মাইল চড়াই পথে উঠে দশ হাজার কয়েক শ ফিট ওপরে আমাদের শেষ আশ্রয় ফুরকিয়ায় এসে পৌঁছলাম। এখানে প্রচণ্ড শীতের ভেতর এসে পড়লাম। রাত্তিরে রাজা সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়ল। সারা রাত অশোক আর আমি জেগে রইলাম। আগুন জ্বেলে তার শরীরটাকে গরম রাখবার চেষ্টা করলাম। বড় উদ্বেগে কাটল রাত্রি। ভোরে সুস্থ বোধ করল রাজা। বলল, চলো পিণ্ডারী যাই।

আমরা মানা করলাম কিন্তু তার উৎসাহকে বাধা দেওয়া গেল না।

জলযোগের পর ফুরকিয়া থেকে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম পিণ্ডারীর দিকে। গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। পথে শুধু হরেক রকমের ফার্ন আর পাহাড়ী ফুল দেখতে পেলাম।

অশোক সাদা কয়েকটা পাহাড়ী ফুল সংগ্রহ করে এনে দিলে আমাদের। আমি আর রাজা দু জনেই সেই ফুল বিনিময় করলাম। এ যেন মনের এক মজার খেলা বলে মনে হল।

তিন মাইল পথ চলে আমরা প্রায় তের হাজার ফিট ওপরে উঠে এলাম। সামনেই হিমবাহ, প্রায় দু মাইল লম্বা তুষারপ্রবাহ। নীল আকাশের বুকে জেগে আছে তুষারমৌলী নন্দাদেবী, নন্দাকোট; তাদের শুভ্র দেহ থেকে তুষার ঝরে এই পিণ্ডারী হিমবাহের সৃষ্টি।

কতক্ষণ তাকিয়ে রইলাম সে দিকে। কোথায় তুষারের ভেতর প্রাণের ফল্গুধারা লুকিয়ে থাকে। হঠাৎ কখন কার ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে দিক দেশ পেরিয়ে সে ছুটে চলে যায়। মানুষের

ভেতরেও এমনি সুপ্ত থাকে প্রেমের ফল্গুধারা। হঠাৎ কোনো জীবনশিল্পীর সোনার তুলির ছোঁয়ায় সে তার মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

এইসব কত কথা ভাবছিলাম হিমবাহের ধারে দাঁড়িয়ে। অশোকের ডাকে ফিরে দেখি রাজা পাথরের ওপর বসে পড়েছে। ছুটে গেলাম তার কাছে। ক্লান্তিতে সে তখন হাঁপাচ্ছিল।

বললাম, চল এখুনি নীচে নেমে যাই।

অশোক আর আমি রাজাকে ধরে নিয়ে যখন ফুরকিয়ার বাংলোতে এসে পৌঁছলাম তখন তিন জনেই ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়েছি।

থামল অহল্যা। মনে হল একটানা এত কথা বলে সত্যই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

কিছু পরে হেসে বলল, প্রগলভ প্রেমের কাহিনী শুনে মনে মনে আমার সম্বন্ধে কি যে ভাবছেন দাদা।

বললাম, ভাবছি মানুষ মনে প্রাণে কতখানি সহজ হলে তবে এসব কথা এমন স্বচ্ছন্দে বলে যেতে পারে।

ঘরের ভেতর হেরিকেনের বাতিটা দপ দপ করছিল। বোধ করি নিভে যাবার পূর্ব সংকেত। উঠে গেল অহল্যা। নিভু নিভু বাতিটাকে উস্কে দিয়ে আবার বাইরে এসে বসল।

হেসে বলল, দাদা, তিন দিন তুষার ঝড়ের ভেতর ফুরকিয়াতে বসে এই আলোটার মত নিভু নিভু রাজাকে আমরা আগলে রেখেছিলাম।

তারপর কি করে যে তিন জনে কৌশানীতে এসে পৌঁছলাম, সে ইতিহাস আজ আর মনে নেই। বোধহয় সেই নিদারুণ অশুভ দিনগুলোকে মনে রাখতে চাইনি, তাই ভুলে গেছি সে দিনের কথা।

বললাম, দুঃসহ বিপদের কথা মানুষ ভুলতেই চায় তবে দুঃখের দিনের স্মৃতি মনে বড় হয়ে জেগে রয়।

অহল্যা বলল, সেই দুঃখের কাহিনীর শুরু হল এবার, যাকে

ভোলার জন্যে নিজের কাছ থেকে আজ পালাতে চেয়েছিলাম। তারপরের ইতিহাস অবশ্য দীর্ঘ নয়। কৌশানী থেকে আলমোড়ায় আমাদের বাসায় এলাম। রাজা সুস্থ হল। দু বন্ধুতে দিল্লী রওনা হয়ে গেল একদিন। কয়েক দিন পরে আমিও মামার সঙ্গে দিল্লী গিয়ে পৌঁছলাম। তখন রাজাকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এরপর আমাদের বিচরণক্ষেত্র হল ওকলা ক্যানেলের ধার, কখনো বা জাহানারার কবরভূমি, কখনো কুতুব। আমাদের সঙ্গে সর্বত্র ছায়াসঙ্গী হয়ে রইল অশোক।

এবার কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল অহল্যা। মনে হল কি যেন একটা বেদনাকে সে চাপতে চাইছে।

এক সময় বলল, দাদা, মানুষের কাছে কতকগুলি অভাবিত মুহূর্ত আসে, একদিন আমার জীবনেও তাই এল। যেখানে দুর্ভাগ্যের কাছে মাথা পেতে নিতে হল, হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেও সেখানে ন্যায়-অন্যায়ের কোন বিচার মিলল না। রাজা আমার ওপর বিরূপ হল। হয়ত তার কিছু কারণ ছিল, কিন্তু আজও মাঝে মাঝে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি কোনো কিছুই আবিষ্কার করে উঠতে পারি না।

বললাম, মানুষের জীবনের গতি কখন কোন খাতে যে বয়ে চলে তা বলা সত্যই অসম্ভব।

অহল্যা বলল, প্রথম দুঃখ পেলাম জাহানারার কবরের পাশে বসে। সেই প্রথম দিন, যে দিন রাজা তার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখতে পারল না।

মনকে বোঝাতে চাইলাম, মানুষের বহু কাজ থাকে যার থেকে সব সময় বেরিয়ে আসা যায় না; হয়তো তেমনি কোনো জরুরী কাজে আটকা পড়েছে রাজা। কিন্তু ভেতরের আর-একটা মন অশান্ত হয়ে উঠল। সে অবুঝ, যুক্তির কোনো কথাই মানতে রাজী নয়। সেই আমার জীবনে প্রথম প্রত্যাখ্যানের দিন—অসহনীয় বেদনার উপলব্ধি।

চীৎকার করে নিজেকে কত কথাই বলতে গেলাম, কিন্তু সব বৃথা। শুধু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। বুকে দুঃসহ বেদনার ভার।

বিরহিণী জাহানারার কবর ছুঁয়ে শান্তি পেতে চাইলাম। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, তুমি তো তোমার আকাঙ্ক্ষিতকে পাওনি, তবু কি তুমি সুখী হয়েছিলে সম্রাটনন্দিনী। যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম, অতৃপ্ত আত্মার হাহাকার বলেই মনে হল। বুক ঠেলে নেমে আসতে চাইল দুঃসহ একটা যন্ত্রণার ঢেউ।

সে দিন যে কেমন করে ঘুরে ফিরেছি, নিজেকে দৈনন্দিন কাজে কি করে জড়িয়ে ফেলেছি তা বলার শক্তি আমার নেই।

থামল অহল্যা। সীমাহীন বেদনার নীরবতা। হয়তো বা অতীত দুঃখের আস্বাদন করছে সে মনে মনে।

এক সময় কথা বলল সে। নিজেকে সহজ করে নিয়েই বলল, এরপর অশোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে কয়েক বার কিন্তু বহু চেষ্টা করেও রাজার দেখা আর পাইনি। অশোক আমাকে নানা কথায় ভুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু অবুঝ মন তা মেনে নেয়নি।

রাজার নাকি বিদেশ যাবার সব ঠিক হয়ে গেছে, এমনি একটি খবর যে দিন এক বান্ধবীর মুখে শুনলাম, সে দিন অশোককে তার বাড়িতে গিয়ে ধরলাম—যেমন করেই হক যাবার আগে আমার সঙ্গে ওর একবার দেখা করিয়ে দিতে হবে। অশোকের দুটি হাত ধরে মিনতিতে ভেঙে পড়লাম।

মনে হল অশোক অভিভূত হয়েছে। সে বলল, শেষ চেষ্টা করে দেখব অহল্যা, কথা দিচ্ছি তোমায়।

আজ ভাবি, মনের কাছে এত ছোট হয়ে গিয়েছিলাম কি করে। কেন গেলাম তার খোঁজ নিতে যে আমার সঙ্গে তার বাঁধন শিথিল করে দিতে চায়।

অশান্ত মন সে দিন বোঝেনি, তাই চরম আঘাত মাথা পেতে নেবার জন্যেই বুঝি সে এমন আকুল হয়ে উঠেছিল।

বসেছিলাম কুতুবের পাশে অসমাপ্ত একটি ঘরের ভেতর। অশোক রাজাকে নিয়ে আসবে, তাই আমার প্রতীক্ষা।

সে দিন রাজার যাত্রার দিন। ধনীর ছেলে সে। প্লেনে যাচ্ছে ফ্রান্স। মিনতি জানিয়ে একটি চিঠিও লিখেছি—শুধু তোমাকে দেখতে চাই। কৌশানীর চীরগাছের তলায় যে শীলাস্তূপের ওপর আমাদের স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল একদিন, তার কথা ভেবে একটিবার শুধু আমার সামনে এসে দাঁড়াও।

একটি মূর্তি এল। অসমাপ্ত গৃহের দরজা দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

কোনো প্রশ্ন করার শক্তি তখন আমার নেই, আর দরকারও ছিল না তার। অসমাপ্ত প্রাসাদের মত আবরণহীন মনটা মুহূর্তে শূন্য হয়ে গেল। ক্ষীণ আশার দীপটাও নিভে গেল দমকা হাওয়ায়। শূন্য ঘরে শুধু কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল ছাই-হয়ে-যাওয়া মনের অবশেষ।

কতক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসেছিলাম জানি না, এক সময় মাথায় অশোকের হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ তুলে চাইলাম।

বেদনায় থম থম করছিল অশোকের মুখ। ধীরে ধীরে সে বলে গেল কটি কথা—

অহল্যা তোমার দুঃখে মিথ্যা সান্ত্বনা আজ আর দেব না—শুধু একটি কথা তোমাকে জানাতে চাই। একবার চেয়ে দেখ দেখি আমার দিকে। তোমার রূপ আছে, শিক্ষা আছে, আর রয়েছে পাখির মত কোমল একটি হৃদয়; আর আমি! রূপহীন দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছি। আমার সব থেকেও আমি রিক্ত। তবু কোনো দিন এ নিয়ে আমি তো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইনি। এ আমার ভাগ্যের দান তাই মাথা পেতে বয়ে চলেছি এ অভিশাপ।

তাকিয়ে রইলাম অশোকের দিকে। রুদ্ধ মনের একটি বাতায়ন হঠাৎ খুলে গেল। নির্মল শুভ্র এক ঝলক আলো লুটিয়ে পড়ল তার

ভেতর। মনের দেয়ালে লগ্ন আয়নায় দেখলাম একটি প্রশান্ত মুখের ছবি পড়েছে। সে মুখ রাজার নয়, সে মুখ অশোকের; যার কাছে আমার প্রেমকে আমি নির্ভয়ে পরম নিশ্চিন্তে রেখে দিতে পারি।

অহল্যা কাহিনীতে ছেদ ফেলে দিলে।

বললাম, মানুষের মন যখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তখন হঠাৎ এমনি কোনো অভাবিত জীবন-যাদুকরের আশ্চর্য লীলায় তা আবার জোড়া লাগে।

বলল অহল্যা, আমার সব কথা মামাকে বললাম। অশোকের মায়ের কাছে মামা নিজেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। অসচ্ছল অবস্থা অশোকের। মামাই তাকে সমস্ত খরচ দিয়ে আমেরিকা পাঠিয়েছেন জার্নালিজম পড়বার জন্যে।

বললাম, খুব সুখী হয়েছি অহল্যা তোমার এই নির্বাচনে।

অহল্যা বলল, তবু কৌশানীতে এসে ঐ চীর গাছের তলায় পড়ে-থাকা পাথরটাকে দেখে আমার সমস্ত অতীত ভুলে-যাওয়া পথ ধরে ফিরে আসতে চাইছে দাদা। তাই এতক্ষণ নিজের কাছ থেকে পালাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম।

দিগন্তের দিকে তাকালাম। ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হয়ে এসেছে। অগ্নিকোণে অতীতের ক্ষতচিহ্নের মত নিষ্প্রভ বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বলতে পারেন, মানুষ কেন তার অতীতকে ভুলতে পারে না? উদাস দৃষ্টি দূরে মেলে দিয়ে অহল্যা আপন মনেই যেন প্রশ্ন করে।

কি দেব এর উত্তর। এ প্রশ্ন যে সবার মনের।

বলি, ভুলতে চাইলেই কি সবকিছু ভোলা যায়।

মন বলে, আমরা যা পাই তাকেই ধরে রাখতে চাই চিরদিনের করে। কিন্তু তা তো হবার নয়। যাকিছু অপরূপ হয়ে আসে তা

যে অপ্রাপনীয় থেকে যায়। তাই তো তার সুর এমন করে মনের মাঝে দুঃখসুখের ঢেউ তোলে।

কোথায় আজ করুণাদি, কথায় কথায় যাঁর উজ্জ্বল মনের দীপ্তিটুকু ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে। এখন হয়তো তিনি তাঁর নিভৃত ঘরখানিতে ধূপ দীপ জ্বেলে ভাব-সম্মেলনের পদ গাইছেন তন্ময় হয়ে।

'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই।'

নিঝুম আঁধারের মাঝে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে জীর্ণ কাঠের ঘরে শুয়ে হয়তো ছোট্ট মুন্নি ভাবছে সাহেব বাবুদের কথা। হঠাৎ কখন এসে পড়বে এই ভেবে উৎকণ্ঠায় বারে বারে তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

ভাওয়ালীর সেই অজ্ঞাতনামা যুবকটির কোনো খবর না পেয়ে তাঁর দূরবাসিনী মানসী না জানি কি অসহনীয় উৎকণ্ঠায় দিনগুলি কাটিয়ে যাচ্ছেন।

আনন্দবেদনার সাজ পরে এমনি করে আসে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধনগুলি; আবার কখন তারা সরে যায় নিঃশব্দে। জীবন-রস-রসিক তাই তো বলেন,

আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন
সে ত শুধু চমকে ঝলকে
দেখা দেয়, মিলায় পলকে
বলে না আপন নাম
পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।

আজ এখানে বসে আছি, অপরিচিতা অহল্যার সঙ্গে দু দিনের পরিচয়—তবু কত নিবিড় হয়ে উঠেছে।

একদিন এদেরও ছেড়ে চলে যেতে হবে। অশোক ফিরবে বিদেশ থেকে, বিয়ে হবে ওদের। নবজীবনের বার্তাবাহী হলুদ

রঙের নিমন্ত্রণ পত্রখানা হাতে তুলে হয়তো মনে পড়বে অহল্যার —পথের সঙ্গী এই মানুষগুলির কথা। মনে মনে হয়তো ভাববে, কি ভুল হয়ে গেছে ঠিকানাটা না রেখে।

কি হবে ঠিকানার খোঁজ করে। এই তো ভাল, পথের ধারে দু দিনের দেখাশোনা। দু দণ্ডের সান্নিধ্য ; আর তাই নিয়ে জীবনের কোনো-এক কর্মহীন মুহূর্তে হঠাৎ মন কেমন করে ওঠা। এর চেয়ে বড় পাওয়া মানুষের আর কিই-বা থাকতে পারে। তাই সুখ-দুঃখের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয় মন—

এই ভালো আজ এ সংগমে
কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি,
ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়—।

রূপা

আইনস্টাইন

# জীবন-জিজ্ঞাসা

সংকলক ও অনুবাদক : **শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

ভূমিকা : **সত্যেন্দ্রনাথ বসু**, জাতীয় অধ্যাপক

মানুষ আইনস্টাইনের পরিচায়ক এই গ্রন্থে তাঁর সাধারণ অভিমত ছাড়াও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্র এবং শান্তিবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আইনস্টাইনের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংকলন করা হয়েছে। এ যুগের একজন অদ্বিতীয় মানবদরদী মহাপুরুষের মানসলোকের গঠন ও গতিপ্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে এই রচনা সংকলনে। আইনস্টাইনের জীবিতকালে তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে এ সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত হয় তার প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে তাঁর সর্বশেষ রচনাগুলি। এই পুস্তকের অনেকগুলি প্রবন্ধ ইতঃপূর্বে বিশ্বের কোন ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

বিজ্ঞান-রাজ্যের বিস্ময়, পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্রদের মত কৌতুহলাবৃত অসীম প্রতিভাধর এক মহাজ্ঞানীর চিন্তাধারার পরিচায়ক এই গ্রন্থ—জীবন-জিজ্ঞাসা।

জাতীয় অধ্যাপক, **সত্যেন্দ্রনাথ বসু** তাঁর ভূমিকায় বলেছেন :

"শ্রীমান শৈলেশ গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। তিনি আইনস্টাইনের নানাবিধ প্রবন্ধের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন এমন কতকগুলি, যাতে আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্বে বিজ্ঞান ছাড়া যে একটি বিশেষ দিক ছিল এবং সেটি যে তাঁর মূল অহিংসাবাদ ও শান্তিবাদের যা তিনি বিশ্বাস করেন, তার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয়। আমি আশা করি যে চিন্তাশীল পাঠক তাঁর দ্বারা অনূদিত প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে আইনস্টাইনের মত একজন বিরাট মানুষের ব্যক্তিত্বের সাহচর্য পাবেন। আমি এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।"

# বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য অবদান এবং বিশ্বের সাহিত্যসৃষ্টির অদ্বিতীয় নিদর্শন স্বরূপ। শিল্পকলা সংক্রান্ত যাবতীয় সংজ্ঞা তত্ত্বকথা, রসবোধ ও বিচার বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও রয়েছে অপরূপ কথাচিত্র। অতিসূক্ষ্ম ও সাধারণের পক্ষে দুরূহ বিষয়গুলি তাঁর অনণুকরণীয় বাচনভঙ্গীতে সহজ সরল সরস ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে তাঁর দ্বিমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অধ্যাপকের মত শিক্ষা দান করেন নি, সেকালের ঋষি ও গুরুর মতই দীক্ষা দিয়ে গেছেন শিল্পশাস্ত্রে।

'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা, রূপকলার আলোচনা ক্ষেত্রে যুগান্তরকারী গ্রন্থ, এবং এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উন্মেষসাধনে অতুলনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গসাহিত্যের এটি এক অমূল্য সম্পদ।'

—নন্দলাল বসু

বহুকাল অপেক্ষার পরে অবনীন্দ্রনাথের এই উপাদেয় প্রবন্ধ পুস্তক যে পড়তে পেলুম তার জন্য 'রূপা কোম্পানী'-কে ধন্যবাদ। আটাশটি বক্তৃতা প্রবন্ধের এই বইটি দেখা যাচ্ছে তার প্রসঙ্গমূল্য কিছুমাত্র হারায় নি। শিল্পতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্বের সমস্যা উন্মোচনে অবনীন্দ্রনাথের চিন্তা এখনও আমাদের পরিপাকজীর্ণ হয় নি, এখনও মননকে জাগাবার ক্ষমতা এই বক্তৃতাবলীর সময়াপহৃত হয় নি কিছুমাত্র। এবং শিক্ষণীয়তা ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের রচনা স্বকীয় সাহিত্যগুণে আজও সমান আনন্দদায়ক।...'

'চিত্রশিল্পে ও কথাশিল্পের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। সেজন্য যাঁরা সাহিত্যতত্ত্ব পড়তে ভালোবাসেন তাঁরা এই রূপতত্ত্ব ও শিল্পের নানা দিকের কথা পড়লে লাভবান হবেন। খুব যত্ন করে ছাপা, সুন্দর একখানি ফোটোগ্রাফসহ কাপড়ে বাঁধাই। দাম খুবই শস্তা।...'

# বাঙালী

## প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাসের অগ্নিচক্র ঘুরেছে ভারতের উত্তরে আর দক্ষিণে। কিন্তু পূর্ব ভারতের তমসাচ্ছন্ন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বাঙালী। সেই খণ্ডছিন্নবিক্ষিপ্ত বাঙালী আজ সারা ভারতের সমস্যা। তবুও নতুনকে গ্রহণ করবার ক্ষমতায়, সমীকরণের অসাধারণ শক্তিতে সে আজো ভাস্বর। তার বর্তমান বিপর্যয় এক অপরিমেয় দিগন্তের পূর্বাভাস। তাই বাঙালীর ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছেই অনুশীলনের বস্তু। সারা ভারতের পটভূমিতে সেই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

আপনার বইখানি পড়িয়া আনন্দিত ও লাভবান হইলাম। আপনি বাঙালীর কথা অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ সেন

এই সুন্দর পুস্তকটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চিন্তাশীল পাঠকসমাজে ইহার আদর হইবে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

খুব ভালো লেগেছে, আগাগোড়া সমান তৃপ্তি পেয়েছি। ছোট্ট বইটিতে আপনি এত কথা কি করে লিখলেন ভেবে অবাক হচ্ছি। তার চেয়েও অবাক হয়েছি দেশের ইতিহাসে আপনার দৃষ্টি ও অনুরাগের গভীরতা দেখে। এতটা অন্তর্দৃষ্টি আমাদের অনেক পেশাদার ঐতিহাসিকদেরও নেই। আপনার মনন, অধ্যয়ন ও দৃষ্টি সার্থক।

নীহাররঞ্জন রায়

বিভিন্ন আকর হইতে অতি মূল্যবান ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আহরণ করিয়া বাঙালীকে বুঝিবার ও ব্যাখ্যা করিবার যে চেষ্টা গ্রন্থকার করিয়াছেন তাহা উচ্চ অঙ্গের সংশ্লেষণশক্তির পরিচয় বহন করে। মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় সুপরিস্ফুট।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বইখানির অন্যান্য দেশী ভাষায় অনুবাদ ও বহুল প্রচার কামনা করি।

কালিদাস নাগ

# আমার ঘরের আশেপাশে

**ডঃ তারকমোহন দাস**

এম. এস-সি, পি-এইচ. ডি. ( লণ্ডন ), ডি. আই. সি.

রীডার, কৃষি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ

ভূমিকা : **সত্যেন্দ্রনাথ বসু**, জাতীয় অধ্যাপক

নিজেদের দেশের ফুলফল, গাছপালার ওপর এক স্বাভাবিক আত্মীয়তাবোধ মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। দেশের সম্পূর্ণ পরিচয় আজ শুধু নদনদী ও স্থাপত্য-কীর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে দেশের পশু-পক্ষী ও গাছপালার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও। উদ্ভিদের হাত ধরেই আমরা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধাপগুলি পার হয়ে এসেছি। ইতিহাসের পাতা ওলটালে তাই দেখা যায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করে এসেছে বৃক্ষদেবতা। যে সব আমাদের দেশের নিজস্ব গাছপালা তাদের অতুলনীয় রূপ, রস ও সৌরভের সঙ্গে আমাদের রুচি ও রসবোধ কতো নিবিড়-ভাবে জড়িত ছিল তার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে। এই সব দেশজ গাছপালা, আমাদের মাটির সঙ্গে যাদের হাজার হাজার বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তারা আজও পথে-প্রান্তরে জীবনের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে দিগন্ত রঙীন করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের নির্লিপ্ত দৃষ্টির সম্মুখেই।—কি তাদের নাম ? কি তাদের জীবন-বৈশিষ্ট্য ? আমাদের জাতীয়-মানস ও ভাবধারার সঙ্গে কোথায় তাদের সংযোগ ?—সেই কাহিনী পরিবেশনই এই বইএর মূল লক্ষ্য।

## আমাদের অন্যান্য বই